জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩৬তম সংখ্যা

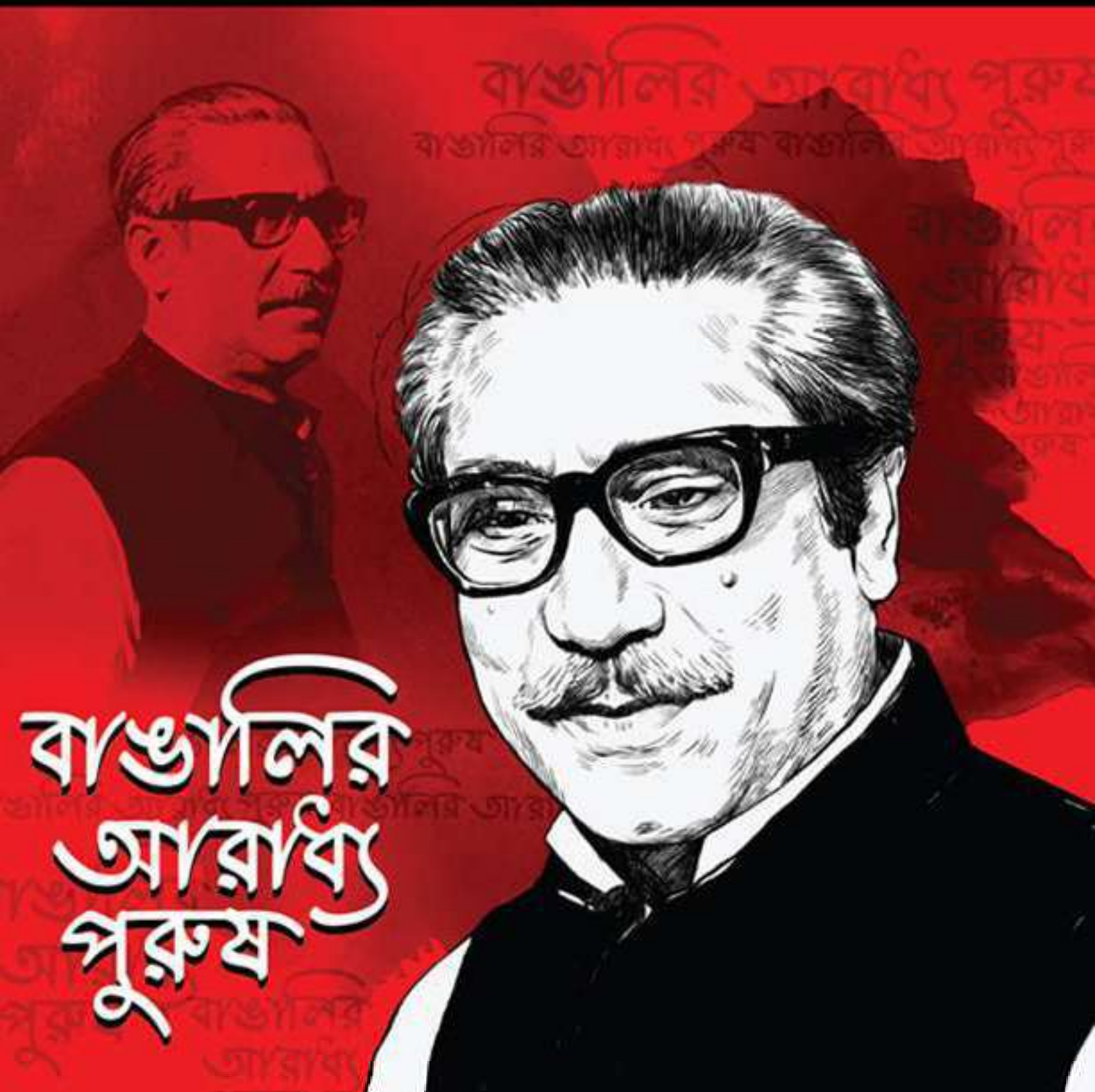

নিরীক্ষা

২৩৬তম সংখ্যা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ (বিশেষ সংখ্যা)

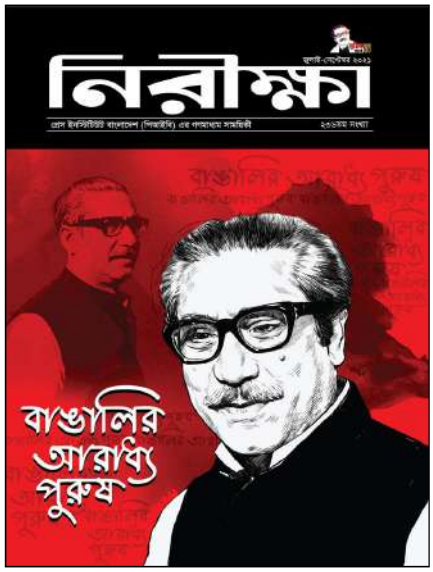

আগস্ট মানে বাঙালির শোকাতুরের মাস। বেদনামথিত মাস। হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তোলার মাস। বাঙালির আবেগ আর শপথের মাস। বাঙালির শোককে শক্তিতে পরিণত করার মাস। এই মাসেই জাতির ইতিহাসের চরমতম শোকবিধুর ও কলঙ্কিত এক অধ্যায় রচিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের এই আগস্টের মধ্যভাগে নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেদিন ইতিহাসের এই মহানায়কের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল শ্যামল বাংলার মাটি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আদর্শ, ত্যাগ, মুক্তি, মানবতা, মহত্ত্ব, ভালোবাসা, ক্ষমা ও বিদ্বেষহীন মহামানবতুল্য অনুপ্রেরণার দিগ্‌দর্শন। তাঁর সমগ্র জীবনের ব্রতই ছিল বাংলা ও বাঙালির মুক্তি। সেজন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন আন্দোলন-সংগ্রামের পথ। জাতির লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন আর স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এজন্য তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন বহুবার। একাধিকবার ফাঁসির মঞ্চও তৈরি হয়েছিল তাঁর জন্য। বাঙালির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল আকাশচুম্বী। সেজন্যই হাসিমুখে, নির্ভীকচিত্তে মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সব ধরনের জুলুম-নির্যাতন বরণ করেছেন তিনি।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একাত্তরের পরাজিত শত্রুদের কূট-ষড়যন্ত্র আর হামলার শিকার হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ ও চেতনা। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ দিয়ে বিচারের পথ রুদ্ধ করে আরেক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর কলঙ্কিত সেই অধ্যাদেশ বাতিল এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু হয়। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া এবং নানা কূটকৌশলের জাল ছিন্ন করে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা এবং কয়েকজন ঘাতকের ফাঁসি কার্যকরের মাধ্যমে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা হয়েছে। তবে মানুষ এখনো প্রহর গুনছে বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের ফাঁসি কার্যকরের প্রতীক্ষায়। এবার দাবি উঠেছে অন্তরালের খুনিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা। আশা করব, দায়মুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মহল এই ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমৃত্যু একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর। তাঁর সেই স্বপ্নের বাংলাদেশের যথাযথ রূপায়ণই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বোত্তম উপায়। বঙ্গবন্ধুর জীবনের আরাধ্য ছিল দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন। আজ তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সে পথেই এগোচ্ছে দেশ।

জাতির পিতার ৪৬তম প্রয়াণ দিবসকে সামনে রেখে 'নিরীক্ষা'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে। সংখ্যাটিতে প্রবীণ ও প্রয়াত কয়েকজন সাংবাদিকের প্রবন্ধ-স্মৃতিচারণ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর আবেদন সর্বকালীন। লেখকদের অনেকেই নানা সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়কে ধারণ করেছেন, কেউ কেউ তাঁর স্নেহধন্যও ছিলেন। কালোত্তীর্ণ এসব প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্মৃতিচারণ এবং সময়ের চিত্র উঠে এসেছে। আমরা সম্পাদকীয় নীতি মেনে প্রবন্ধগুলো হুবহু প্রকাশ করলাম। এই ক্ষেত্রে ঘটনার সময় এবং প্রেক্ষিত পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা হয়নি। প্রবন্ধগুলো পাঠক চাহিদাপূরণে ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস।

জাতীয় শোক দিবসে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক ও স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। বঙ্গবন্ধু, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। তুমি চিরঞ্জীব। তুমিই বাঙালির আরাধ্য পুরুষ।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

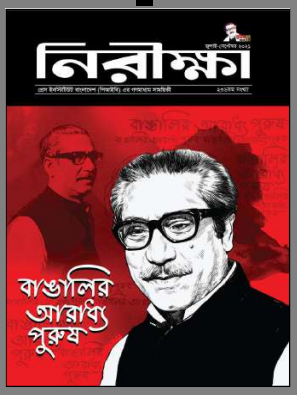

'কাল সকালে তাড়াতাড়ি আসো' এই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা ৫
— তোয়াব খান

ইতিহাসের কাছে এ আমার দায় ৮
আবেদ খান

বঙ্গবন্ধুকে ছবিতে আটকে না রেখে তাঁর দর্শন ও আদর্শের চর্চা হোক ১০
— হাসানুল হক ইনু

একটি অসম্পূর্ণ বিচার ও ইতিহাসের দায় ১৭
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

আগস্ট ট্র্যাজেডি নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীরা ২০
মুহম্মদ শফিকুর রহমান, এমপি

বঙ্গবন্ধু হত্যাকণ্ড: দেশীয় প্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র উন্মোচন হওয়া দরকার ২৪
শ্যামল দত্ত

তিনটি কথোপকথন ও চিরচেনা বঙ্গবন্ধু ২৭
রেজা সেলিম

শোকাহত জাতির শক্তি সঞ্চয়ের দিন ১৫ আগস্ট ৩০
মোল্লা জালাল

বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি ৩২
জাফর ওয়াজেদ

৪০ **আমার দেখা মুজিব**
সুফিয়া কামাল

৪২ **সেই সব চিরন্তন অমলিন স্মৃতি**
ওবায়েদ-উল-হক

৪৪ **সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা**
এ বি এম মূসা

৪৭ **বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু**
কে জি মুস্তাফা

৫০ **অন্য শেখ সাহেব**
আতাউস সামাদ

৫৩ **ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন প্রহর ও বঙ্গবন্ধু**
সন্তোষ গুপ্ত

৫৮ **বঙ্গবন্ধুর জীবনে মাইলস্টোন ফজিলাতুন নেছা**
বেবী মওদুদ

৬৪ **গণভবনে পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শেষ স্মৃতি**
মাহবুব তালুকদার

৬৭ **গণতন্ত্রের যেমন নীতিমালা আছে, সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে**
— বঙ্গবন্ধু

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতীয় শোক দিবস ২০২১

“

আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি, আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি
সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

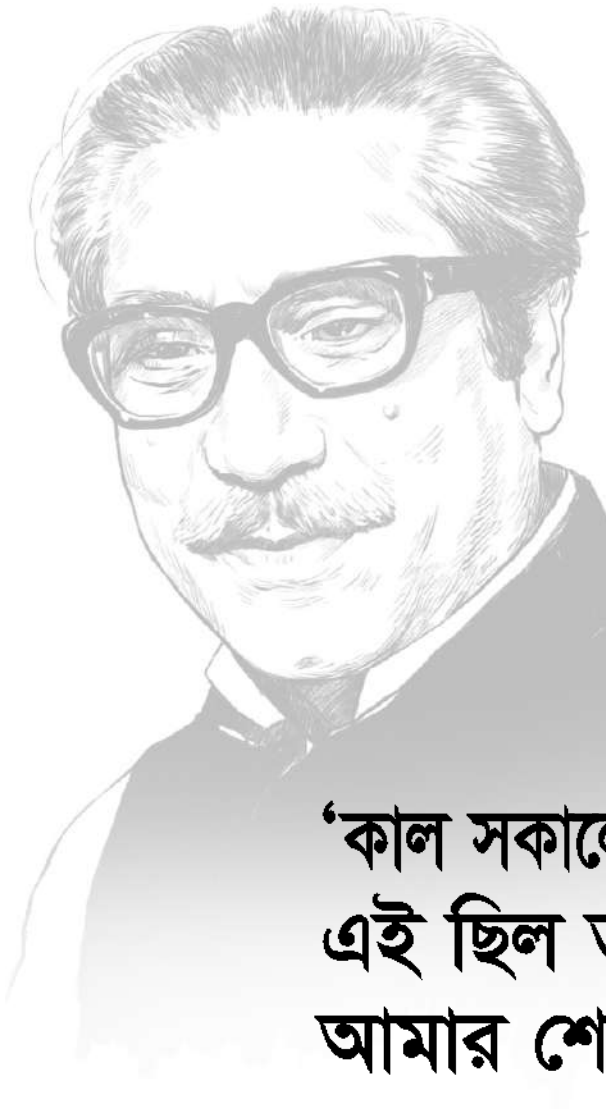

‘কাল সকালে তাড়াতাড়ি আসো’ এই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা

—তোয়াব খান

তোয়াব খান। সাংবাদিকতায় জীবন্ত কিংবদন্তি। বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব হিসাবে কাজ করেছেন। স্মৃতির জানালায় উঁকি দিয়ে তিনি তুলে এনেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার কাটানো দিনগুলোর কথা। কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন- **আলী হাবিব,** সিনিয়র সাংবাদিক

প্রশ্ন: আপনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন। তাঁকে দেখেছেন নিশ্চয় আরও আগে। চিনতেনও। আপনার স্মৃতিতর্পণ দিয়েই শুরু হোক আলাপচারিতা।

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে অনেক আগে থেকেই দেখেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দেখা হয় স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীরা যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকা তো কাজের সূত্রে। আমার ব্যক্তিগত পেশা তো সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার সত্যিকারের যে দর্শন, সেটাই আমি মেনটেইন করার চেষ্টা করেছি। আমার যেটা মনে হতো এবং এখনো মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্কটা ছিল ব্যক্তিপর্যায়ের।

তিনি তো শুধু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সবার। আরও উপরে, তিনি জাতির পিতা। এ হিসাবে সবাই একটা ছত্রছায়া পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে গর্বের বিষয়, আমি তাঁর ছায়ায় থেকেছি।

প্রশ্নঃ তাঁর ওখানে আপনার কাজে যোগ দেওয়ার পেছনে একটা গল্পও তো আছে।

তোয়াব খানঃ প্রধানমন্ত্রীর ওখানে আমি যোগ দিয়েছি ১৯৭৩ সালের মে মাসে। এর আগে কিছু ঘটনা আছে। দৈনিক বাংলা থেকে চাকরি গেল আমার। আমাকে ওই সময় ইনফরমেশন মিনিস্ট্রিতে ওএসডি করা হলো। আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখো, এখন নির্বাচনি প্রচারে ব্যস্ত আছি। যদি নির্বাচনে জিততে পারি, তাহলে আমি প্রধানমন্ত্রী হব। যদি মেজরিটি না পাই, তাহলে আমি জাতির পিতা হিসাবে থাকব। তখন তুমি তোমার মতো কাজ করো। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। আমার কিছু কাজ আছে, সেগুলো তোমাকে করে দিতে হবে।'

> বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সরকারের প্রধান কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রীই নন, জাতির পিতা, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কান্ডারি এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ

প্রশ্নঃ তারপর?

তোয়াব খানঃ তারপর নির্বাচন হয়ে গেল। সাতটি আসন বাদে বঙ্গবন্ধুর দল ২৯৩টি আসনে জিতল। একদিন দুপুরে আমার মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে বাসায় ফিরেছি। স্ত্রী বললেন, গণভবন থেকে দুইবার টেলিফোন করেছিল। তোমাকে এক্ষুনি যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আমি যোগাযোগ করলাম। আমাকে যেতে বলা হলো। তখন দুপুর ২টা কিংবা আড়াইটা বাজে। গণভবনে গেলাম। বঙ্গবন্ধু তখন সবেমাত্র লাঞ্চ করেছেন।

তিনি বললেন, 'কোথায় ছিলে তুমি? ইলেকশন হয়ে গেছে। এখন তো তোমাকে যোগ দিতে হবে। আমার কাজ করতে হবে।' আমি কাজে যোগ দিলাম। তারপর বঙ্গবন্ধু আমাকে জানালেন, তিনি একটা আত্মজীবনী তৈরি করবেন। দুনিয়ার সব রাজনৈতিক নেতা এই আত্মজীবনী তৈরি করেন, তখন এটা তাঁরা ডিকটেশন দিয়ে যান। এগুলো চেক করা। ট্রান্সক্রাইব করা। এডিট করা।

এ সময় বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক পেয়েছেন। তিনি একটি বক্তব্য দেবেন। আমাকে বললেন, 'বক্তৃতা লিখে ফেলো।' বক্তৃতা লিখে দিলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, 'তুমি যদি আগে আসতে, তাহলে আমার অনেক কাজ বেঁচে যেত। ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতাম। তোমাকে এখানে নিয়ে আসার আগে ঘটনাগুলো যে ঘটল, সেটাও ঘটত না।'

প্রশ্নঃ আপনি বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা যদি বিস্তারিত বলেন...

তোয়াব খানঃ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করাটা যে গৌরবের বিষয়, এটা উল্লেখের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবু বলতে হচ্ছে। কারণ, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে গণভবনে যোগ দিতে হয়েছিল। এ কথাটি মনে রেখেই বলতে হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সরকারের প্রধান কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রীই নন, জাতির পিতা, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান কান্ডারি এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। ব্যক্তি শেখ মুজিবও অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই যে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে আসি না কেন, সম্পর্কের নৈকট্য স্থাপনে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। কর্মক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকেই বঙ্গবন্ধুই ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। সরকারি দপ্তরে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মতো বহিরাগত অর্থাৎ সরকারি চাকুরে বা সার্ভিসের লোক নন, তাদের জন্য পরিবেশটা বৈরী না হলেও অনুকূল থাকে না। সাধারণভাবে এটাই সত্য। গণভবনে আমার জন্য অবশ্য পরিবেশটা প্রথম থেকেই অস্বস্তিকর হয়নি। কাজ বা ব্যক্তিপর্যায়ের সম্পর্কের আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেছে শুরুতেই।

প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, পলিটেশিয়ানদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। খুব স্বাভাবিক আমার সংকোচ ছিল। দ্বিধা ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজেই ডেকে এগুলো দূর করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ বঙ্গবন্ধুর কোন জিনিসটি আপনি মনে করেন যে এখনকার সময়ে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং একান্ত দরকার।

তোয়াব খানঃ আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর যে নীতি-আদর্শ ছিল, সেগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার। কিছু হচ্ছে। আরও দরকার। এক্ষেত্রে নিজে বোঝার চেষ্টা করেছি। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, ধর্মের ক্ষেত্রে সব ধর্মের সমান অধিকার। এটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। সমাজতন্ত্র নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ছিল। এটা কী? যেমন ধরা যেতে পারে, মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র আছে। পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্র আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে সমাজতন্ত্র ছিল ভিন্ন। এদেশের মানুষ গরিব। তাদের মুখে হাসি ফোটানোটাই বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'এদের সমাজতন্ত্র খুব কঠিন না। আমাদের যে মধ্যবিত্ত চরিত্র, এখানে সমাজতন্ত্র হবে যারা গরিব, তাদের এই পর্যায়ে নিয়ে আসা। শোষিত মানুষের সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু যখন আলজেরিয়ায় যান, তখন একদিকে হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড সমাজতান্ত্রিক দেশ। এই দুই ভাগে বিশ্ব ভাগ। এ দুই

ভাগের মধ্যে বাইরে যারা, যেমন–জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। এরা আলাদা। তখন একটা স্লোগান উঠল–থার্ড ওয়ার্ল্ড। একসময় সেটা খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বঙ্গবন্ধু যখন গেলেন, তখন প্রশ্ন উঠল–আমরা কি থার্ড ওয়ার্ল্ডের লোক? নাকি জোটনিরপেক্ষ? বঙ্গবন্ধু তখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কী, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কী– এসব মৌলিক প্রশ্নে না গিয়ে বললেন, 'দুনিয়ার সবাই শোষিত। আমরা সব সময় শোষিতের দলে।' শোষিতের দলে আমরা। আমরা এখনো শোষিতের পক্ষে কাজ করছি।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কখন হয়েছিল?

তোয়াব খান: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ১৪ আগস্ট রাতে। ওইদিন একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেটা ফেনীতে ক্রাশ করে। তখন রটে যায়, উইদাউট পারমিশনে সেটা যাচ্ছিল। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সেটাকে গুলি করে নামিয়েছে। এটা মিথ্যা কথা। হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনায় পড়েছে। তখন তো দেশে ইমার্জেন্সি চলছে। রেডিয়ো-টেলিভিশন থেকে সবাই জানতে চাচ্ছে ঘটনাটি কী। আমি তখন চিন্তা করছি কাকে ধরা যায়। যেহেতু হেলিকপ্টার বিমানবাহিনীর। আমি প্রথমে আমার বন্ধু খাদেমুল বাশার, উপপ্রধান বিমানবাহিনী, তাঁকে ফোন করলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই কিছু জানিস কি না।' সে বলল, 'এই ঘটনা।' তারপর খন্দকার সাহেবকে ফোন করলাম। তখন তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান। তিনিও বললেন, 'ঘটনা এই। যেটা রটেছে সেটা ঘটনা না।'

তখন আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম। এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি।'

এরই মধ্যে খবরের কাগজ থেকে এগুলো জানতে চাচ্ছে। টিভি জানতে চাচ্ছে এ নিউজটা আমরা দেব কি না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'নিউজ চাপা দিলে গুজব বাড়ে। গুজবকে মারতে হলে সত্যি ঘটনাটা জানানো উচিত। তুমি সত্যি ঘটনাটা দাও।'

প্রশ্ন: এরপর রাতেও নিশ্চয় কথা হয়েছে? পরদিন তো তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল?

তোয়াব খান: আমার মনে আছে, ১৪ আগস্ট রাতে আমি বসে কাজ করছিলাম। বঙ্গবন্ধু পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। বিশেষ কনভেনশনে বক্তব্য দেবেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ওই বক্তৃতা এক্সটেম্পোর দেবেন। কারণ বঙ্গবন্ধুর কতকগুলো স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একসময় বঙ্গবন্ধুকে বহিষ্কার করেছিল। সেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুকে একটা ডক্টরেক্ট ডিগ্রি দেবে। আমাকে বললেন, 'তোমার যে ডেটা ইনফরমেশন যোগ করার দরকার হয়, এটা মোটা কার্ড পেপারে লিখে আমাকে দেবে।' বাসায় বসে লিখছি। রাত তখন প্রায় ১২টা হবে। হঠাৎ লাল টেলিফোনে বঙ্গবন্ধু ফোন করলেন, 'কাল সকালে তুমি তাড়াতাড়ি আমার বাসায় চলে আসবা। আর কার্ড নিয়ে আসবা। মোটা মোটা অক্ষরে। আমি এক্সটেম্পোর বক্তৃতা করব। প্রয়োজনে এই কথাগুলো বলব।' বললাম, আমি ওই কাজই করছি। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি আসো।' এই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা।

প্রশ্ন: তারপর...

তোয়াব খান: ১৫ আগস্ট আমি ছিলাম গণভবনের পাশে সরকারি বাসভবনে। ভোর হয়েছে। সবাই যেমন শুনেছে। আমিও গোলার আওয়াজ শুনেছি। মর্টারের আওয়াজ শুনেছি। তারপর রেডিয়ো অন করা হয়েছে। সব জায়গায় কান্নার রোল পড়েছে।

আলী হাবিব: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

তোয়াব খান: তোমাকেও ধন্যবাদ।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

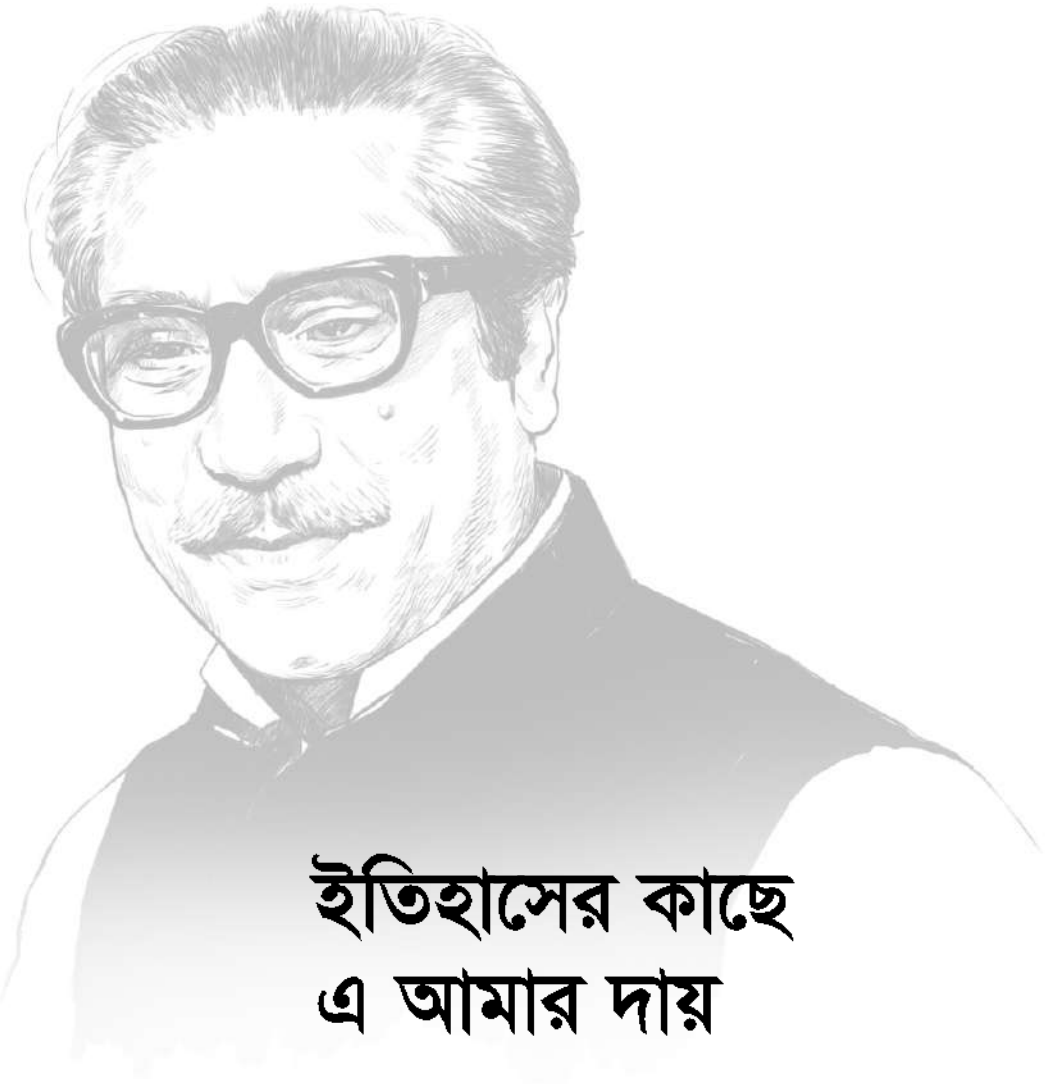

ইতিহাসের কাছে এ আমার দায়

আবেদ খান

'ইতিহাসের কাছে এ আমার দায়'–বঙ্গবন্ধুকে হত্যার আগেই একরকমের দৈবাৎক্রমে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর হত্যার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই লেখাটি। ১৫ আগস্ট বারবার ফিরে আসে এবং অনুরূপভাবে আমার কাছে ইতিহাসের দায়ের বিষয়টিও সেভাবেই ফিরে আসে। কিন্তু যতবারই এই বিষয়ে লিখি, ততবারই এর বর্ণনা তো একইভাবে উঠে আসে এবং আসবেও। তবে বর্তমান যে পরিপ্রেক্ষিত লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে কুশীলবদের চেহারা পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু ধরন রয়েই গেছে।

এই লেখাটি না লিখলে দেশ ও জাতির কাছে, সর্বোপরি ইতিহাসের কাছে আমি দায়বদ্ধ থেকেই যাব– সেজন্যই কলম ধরা। এমনিতেই বয়স আমার স্মৃতিহরণ শুরু করেছে, এখনই যদি সেখান থেকে এটুকু উদ্ধার না করি, তাহলে হয়তো পুরো ঘটনাটাই একসময় বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে।

পঁচাত্তর সালের কথা। আমি তখন দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার হিসাবে কাজ করি। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নিয়মিত ছাপা হয় আমার একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টিং সিরিজ। নাম 'ওপেন সিক্রেট'। সিরিজটা বেশ

পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করার কারণে বিভিন্ন সংবাদসূত্র (নিউজ সোর্স) আমার কাছে চলে আসত। ঠিক সেভাবেই একদিন দুপুর ১২টা নাগাদ অফিসে একটা টেলিফোন এলো। সম্ভবত, ১৯৭৫ সালের মার্চের গোড়ার দিককার কথা। আমি অফিসে বসে লিখছিলাম, অপারেটর ফোনটা থ্রো করল রিপোর্টিং টেবিলে আমার কাছে। রিসিভার তুলে দেখি, ওপ্রান্তে আছে আমার কৈশোরের সহপাঠী ও বন্ধু শাহাদত চৌধুরী, সাপ্তাহিক বিচিত্রার। সে তখনো সম্পাদক হয়নি, তবে মোটামুটিভাবে বিচিত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। শাহাদত আমাকে বলল, "তোকে একটা বোম ফাটানো 'ওপেন সিক্রেট' লেখার মসলা দিতে পারি। সাহস করে লিখতে পারবি?" বললাম, 'আমি ভয় পাই না, সে তো তুই জানিসই। বল, কীভাবে পাব!' সে বলল, 'সাড়ে ৩টায় তোর অফিসের নিচে একজন গাড়ি নিয়ে আসবে, খবর পাঠালে চুপচাপ চলে আসবি।'

গাড়ি এলো কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ৩টায়। স্টিয়ারিংয়ে একহারা সুদর্শন সুবেশী এক যুবক। একটানে গাড়ি নিয়ে গেল দৈনিক বাংলার নিচে। শাহাদত নেমে এলো। আমাদের নিয়ে গাড়ি চলল বাংলামোটরের দিকে। আমরা কেউ কথা বলছি না, যেন এক রহস্যময় অভিযানে যাচ্ছি। আমি জানি না গাড়ি কোথায় যাচ্ছে। যুবকটি গাড়িটা নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টের ভেতর। তখন ক্যান্টনমেন্ট এখনকার মতো এত ইমারতে ঠাসা ছিল না। আর ক্যান্টনমেন্ট সম্পর্কে আমারও তেমন কোনো ধারণা ছিল না। বলতে পারব না কোন পথ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি বাংলো ধরনের বাড়িতে। তখন বিকাল সাড়ে ৪টা হবে। মনে হলো, শাহাদত বাড়িটা চেনে এবং সম্ভবত গৃহকর্তাকেও। কারণ, আমরা যখন বাংলোর লনে রাখা চেয়ারে বসলাম, তখন সুন্দরী গৃহকর্ত্রী এলেন হাসিমুখে। শাহাদত তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করল এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মেজর ডালিমের স্ত্রী 'নিম্মি' বলে। প্রসঙ্গটা ওঠাল শাহাদতই। বেইলি রোডের লেডিস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক বিয়ের অনুষ্ঠানে কীভাবে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তারই সবিস্তার বিবরণ। বোধহয় শাহাদতের ইচ্ছা ছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ইত্তেফাকে একটা রিপোর্ট লিখি। কিংবা হতে পারে ইচ্ছাটা ছিল অন্য কারও, যা প্রকাশিত হয়েছে শাহাদতের মাধ্যমে।

আমরা যখন লনে কথা বলছিলাম, তখন বাংলোর একটি কক্ষ থেকে ছয়-সাতজন তরুণ সেনা কর্মকর্তাকে বের হতে দেখলাম। শাহাদত তাদের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, মেজর ডালিম। শ্যামলা, সুদর্শন। মেজর ডালিম তার বন্ধুদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের মধ্যে তিন-চারজনের নাম লিখে রেখেছিলাম পরে আমার রিপোর্টে—কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশীদ, মেজর নূর, কর্নেল শাহরিয়ার। পরে শাহাদতের কাছ থেকে জেনেছি, ঘাতকচক্রের আরও কয়েকজন ছিল এবং ওখানে ওদের গোপন বৈঠক হচ্ছিল। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর কর্নেল ফারুককে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল এবং তার কথাবার্তাও ছিল বল্গাহীন। রশীদকে মনে হচ্ছিল শান্ত, স্বল্পভাষী এবং নীরব পর্যবেক্ষণকারী। মেজর নূরকে দেখলাম, নিস্পৃহভাবে একটা কাঠি দিয়ে পাঁচিলের একটা গর্ত খোঁচাচ্ছে। মেজর ডালিম আমাকে বারবার অনুরোধ করছিল লেডিস ক্লাবের ঘটনাটা লেখার জন্য। ওদিকে কর্নেল ফারুক সক্রোধে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদগার করছিল এবং কর্কশ কণ্ঠে আমাকে বলছিল, 'ইউ উইল সি, দেয়ার ইউল বি আ ন্যাশনাল ইস্যু ভেরি সুন' (তুমি দেখো, শিগগিরই একটা জাতীয় ইস্যু তৈরি হবে)। যতই আমার বন্ধু শাহাদত, মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী আমাকে লেডিস ক্লাবের ঘটনা নিয়ে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করুক না কেন, আমার মস্তিষ্কের গভীরে তখন 'ওপেন সিক্রেট'-এ এক বিপজ্জনক প্রতিবেদন দানা বাঁধছে। বারবার মনে হচ্ছিল, লেডিস ক্লাবের ঘটনা পত্রিকায় ছাপানোর উদ্দেশ্য এক ক্রমঘনায়মান ষড়যন্ত্রকে আড়াল করার প্রয়াস মাত্র। কিন্তু ওই বিপজ্জনক স্থানে বসে আমার মানসিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ সঠিক হবে না অনুমান করে নীরব থাকলাম।

সন্ধ্যায় আমি ফিরলাম আমার অফিসে। শাহাদত হাটখোলায় তার বাড়িতে। পথে শাহাদত জিজ্ঞেস করল, 'স্টোরিটা কেমন বলে মনে হয়?' বললাম, 'দারুণ'! শাহাদত বলল, 'তুই ভালো বুঝিস কী লিখবি, কীভাবে লিখবি!' অফিসে ফিরে লিখলাম রিপোর্ট—লেডিস ক্লাবের ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ তাতে নেই—আছে কিছুসংখ্যক তরুণ সেনা কর্মকর্তার গোপন বৈঠক এবং ক্ষোভের বিস্তারিত বিবরণ আর আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস। শিরোনাম ছিল: 'তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক' শোল্ডার হেডিং এবং মূল হেডিং 'সেনা বিদ্রোহের আশঙ্কা'।

রাতে লেখাটা সরাসরি প্রেসে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেলাম বাড়িতে। তখন বার্তা সম্পাদক মরহুম আসফউদ্দৌলা রেজা। আমার লেখার ওপর তাঁর এতখানি আস্থা ছিল যে, তিনি স্ক্রিপ্ট দেখতে চাইতেন না। আমি বাসায় ফিরে ভাবছি একটা দারুণ চাঞ্চল্যকর 'ওপেন সিক্রেট' ছাপা হবে পরদিন। কিন্তু দেখলাম, পরদিন রিপোর্টটা ছাপা হয়নি। রেজা ভাই টেলিফোনে জানালেন, চিফ ফোরম্যান খন্দকার বজলুর রহমান আমার লেখা নিয়ে রেজা ভাইকে দিয়ে বলেছিলেন, "রেজা সাহেব, এই 'ওপেন সিক্রেট'টা নিয়ে ছোটো সাহেবের (আনোয়ার হোসেন মঞ্জু) সঙ্গে কথা বলেন।" রেজা ভাইয়ের কাছ থেকে বিষয়টি শুনে সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু লেখাটি না ছাপানোর নির্দেশ দেন এবং আমাকে বলা হয়, আমি যেন 'ওপেন সিক্রেট' সিরিজটি বন্ধ করে দিই।

সেই মুহূর্তে আমার কাছে 'ওপেন সিক্রেট' সিরিজের চেয়ে পরিস্থিতিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান আমলে একসময় আমার চিফ রিপোর্টার ছিলেন তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। তিনি তখন বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রভাবশালী তথ্য প্রতিমন্ত্রী। গেলাম তাঁর কাছে, খুলে বললাম ঘটনার কথা, আশঙ্কার কথা। জানতাম, তাহের ঠাকুর বঙ্গবন্ধুর খুব বিশ্বস্ত। তাই চাইলাম, তিনি যেন বঙ্গবন্ধুকে খুলে বলেন সবকিছু। ১৫ আগস্টে বুঝেছিলাম, কী ভুল জায়গায় কথা বলেছি আমি। ওদিকে রেজা ভাইয়ের সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের ছিল দারুণ খাতির। আর খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে ইত্তেফাকের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত নিবিড়।

আমার অজ্ঞাতসারেই আমার রিপোর্টের ওপর কঠোর নজরদারি চলতে থাকল। সেদিকেও আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চারপাশ তখন আমার নাগালের অনেক বাইরে। সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের দুজনকে চিনতাম—একজন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর এবং অন্যজন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, চিফ অব জেনারেল স্টাফ। যোগাযোগ করলাম খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। তিনি আমাকে বললেন তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা-বেলোনিয়ায় যেতে। সেখানে তিনি আমার কথা শুনবেন একান্তে। গেলাম কুমিল্লা। সঙ্গে নিলাম বন্ধু ইকবাল সোবহান চৌধুরীকে। সে তখন বাংলাদেশ অবজারভারের রিপোর্টার। ফেরার সময় খালেদ ভাই আমাকে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। আমি সবিস্তারে আমার আশঙ্কার কথা বললাম। তিনি শুনলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তারপর আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, ব্যাপারটা তিনি দেখবেন। আমি তাঁর কথায় আস্থা রেখেছিলাম বটে; কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারিনি। কারণ বারবার কর্নেল ফারুকের সেই কঠিন উচ্চারণ আমাকে শঙ্কিত ও কণ্টকিত করে রেখেছিল।

অবশেষে ঘটেই গেল পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট। সেদিন যদি আমার ওই রিপোর্টটা প্রকাশিত হতো, তাহলে হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাস এত ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ দ্বারা মসিলিপ্ত হতো না। পরে একসময় বন্ধু শাহাদতকে বলেছিলাম পুরো ঘটনাটা লেখার কথা। সে বলেছিল, 'এখনো সময় আসেনি বন্ধু। চারদিকে ওদের জাল ওরা বিছিয়ে রেখেছে। আমি একদিন লিখব, তুইও তখন লিখিস।'

শাহাদত পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, সম্ভবত তাঁর স্মৃতিকথা এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। যে কারণে আমরা কেউ জানতেও পারলাম না শাহাদত কতটুকু জানত কিংবা কতটুকু বুঝেছিল অথবা তাঁর সঙ্গে ওদের কী সম্পর্ক ছিল।

সেদিন বঙ্গবন্ধুর চারপাশে যারা ক্রমান্বয়ে পজিশন নিচ্ছিল এবং যাদের জন্য পাকিয়ে ওঠা ষড়যন্ত্রের কথা বঙ্গবন্ধুর কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছিল না—এখন শুধু ভাবি, তারা কি সব সময় সব যুগে থাকে সব ক্ষমতাসীনের পাশে?

লেখক: সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক জাগরণ

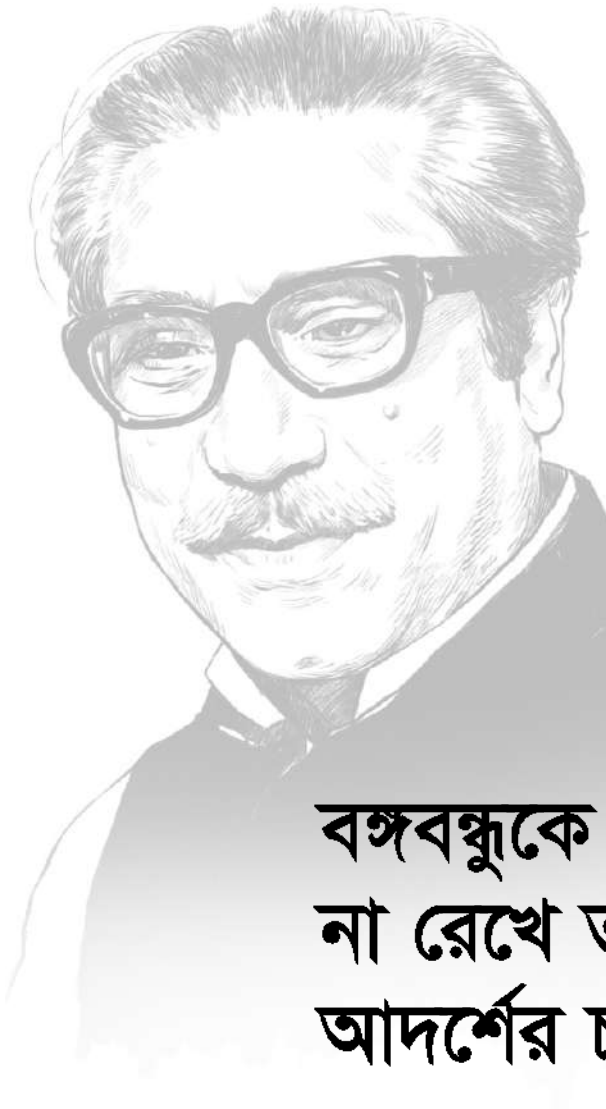

বঙ্গবন্ধুকে ছবিতে আটকে না রেখে তাঁর দর্শন ও আদর্শের চর্চা হোক

— হাসানুল হক ইনু

হাসানুল হক ইনু; জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি। সাবেক তথ্যমন্ত্রী। বর্তমানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি। তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম নেতা। মহাজোট গঠনেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে পল্টনে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের নেতৃত্ব দানকারীদের অন্যতম তিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে জাতীয় কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য ছিলেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখা এবং

জানার সুযোগ হয়েছিল তার। দেশ স্বাধীনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী আন্দোলনসহ রাজনীতির নানা বিষয় উঠে এসেছে নিরীক্ষা'র আলাপচারিতায়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন- **বনশ্রী ডলি**

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় কীভাবে? ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাই?

হাসানুল হক ইনু: বঙ্গবন্ধুর নাম শুনেছি কলেজ জীবনেই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু জনসভায় ভাষণ দিতে এলেন, সেদিনই প্রথম দেখি বঙ্গবন্ধুকে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ছাত্রলীগে যোগ দেওয়ার পর, তখন আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র। উনসত্তরে ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলাম। তখন কিছুটা দূর থেকে দেখেছি, কথা বলার সুযোগ হয়নি। সে বছরই বুয়েটের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব শেষ করে বুয়েট ছাত্রলীগ শাখার সম্মেলন করেছিলাম। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন আলোচনার বিষয় ছিল। কারণ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেল থেকে বের হওয়ার পর অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাননি; কিন্তু বুয়েটের ছাত্রলীগের সম্মেলনে কেন যাবেন বঙ্গবন্ধু? এটা সবার কাছে প্রশ্নবোধক ছিল। সেদিন কেন তিনি সম্মেলনে আসতে সম্মত হয়েছিলেন, তা বঙ্গবন্ধুই জানেন। মনে পড়ে, তখন বুয়েটের অডিটোরিয়ামটা ছিল ছোটো; কিন্তু বুয়েটে তখন বড়ো ও আধুনিক জিমনেশিয়াম ছিল একটা। জিমনেশিয়ামটা খালি করে সম্মেলনের ব্যবস্থা করি। কারণ, সেখানে হাজার খানেক ছাত্র বসতে পারে। সেখানে সম্মেলন করার জন্য অনুমতি আদায় করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। সম্মেলনে তিনি লম্বা ভাষণ দেননি। তবে তিনিই ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং বেলা ১১টা থেকে ১টা–দুই ঘণ্টার মতো উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একই মঞ্চে বসার প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা আমার। সেদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সেসময়ের ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের কয়েকজন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কুশল বিনিময় আর টুকটাক কিছু কথা হয়েছিল আমার। এটা আমার জন্য একটা বিশেষ ঘটনা এবং প্রেরণার বিষয় ছিল। বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি পল্টন ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা করতে। এরপর কয়েকবার ৩২ নম্বরে তাঁর বাসায় দেখা হয়েছে, সালাম বিনিময় করেছি। তেমন কথা হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর বড়ো মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইডেনে পড়ার সময় সেখানে নির্বাচন করেন। তখন শেখ হাসিনা দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময়টাতে কাজের সুবাদে আসা-যাওয়া ছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে; কিন্তু কাছে বসে কথা বলা হয়নি। দেখলে স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে বলতেন, 'কেমন আছো, নাশতাটাশতা খেয়ে যেও।'

ছাত্রলীগের কর্মী হওয়ায় উনসত্তরের গণ-আন্দোলন বা গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রি পর্যন্ত সব আন্দোলন-সংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি–সবকিছুতেই জড়িত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়টাতে ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমদের নেতৃত্বে গোপন সংগঠন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াস সংগঠনের সদস্য হই। তখন ছাত্রলীগের কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনের আড়ালে স্বাধীন বাংলার জন্য মুক্তিযুদ্ধের যেসব কাজ হচ্ছিল সবকটিতেই যুক্ত হই। বিশেষ করে গোলাবারুদ সংগ্রহ, বোমা তৈরি ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, প্রশিক্ষণের কাজ, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে জড়িত হয়ে পড়ি। তখন আমি বুয়েটে শেষ বর্ষের ছাত্র। বয়স ২২-২৩ হবে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, দিনের বেলা একধরনের আর রাতে আরেক ধরনের কাজ করতে হতো আমাদের। সবই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। সেই সুবাদে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা না হলেও আমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি জানতেন এবং কাজের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাহাত্তরের জাতীয় কৃষক লীগ ঘোষণা করা হয়। সভাপতি করা হয় খন্দকার আব্দুল মালেক এমসিএকে, আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। আমাকে সাধারণ সম্পাদক করায় রাজনৈতিক মহলে অনেকের ভ্রু কুঁচকে গিয়েছিল। কারণ, তখনো গণপরিষদ বহাল আছে। সব মিলিয়ে ৪৫০-এর মতো গণপরিষদ সদস্য রয়েছেন, যারা আমার সিনিয়র। নামকরা অনেক ছাত্রনেতা ছিলেন; কিন্তু আমার মতো একজনকে জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক করাটা একটা আশ্চর্যজনক ঘটনাই মনে হয়েছে আমার কাছে। প্রথমে কৃষক লীগের ৮১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি করা হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন বড়ো বড়ো নেতা ও কর্মী।

"বঙ্গবন্ধুর বড়ো মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইডেনে পড়ার সময় সেখানে নির্বাচন করেন। তখন শেখ হাসিনা দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময়টাতে কাজের সুবাদে আসা-যাওয়া ছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে; কিন্তু কাছে বসে কথা বলা হয়নি। দেখলে স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে বলতেন, 'কেমন আছো, নাশতাটাশতা খেয়ে যেও"

আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কোনো হৃদ্যতা ছিল না, সকাল-বিকাল ওঠাবসাও ছিল না। আমার মতো অখ্যাত একজনকে ক্ষমতাসীন দলের একটা জাতীয় ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করি। তবে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এটুকু যে, আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের দেরাদুনের তান্দুয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রধান কমান্ডার ছিলাম। যেখানে ১০ হাজার ছাত্র-যুবক আমার তত্ত্বাবধানে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এটা হয়তো একটা যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এই দায়িত্ব দেওয়ার পেছনে। দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার সমপর্যায়ের ও সিনিয়র নেতাদের সামনে কিছুটা বিব্রতও হয়েছি। তবে আমি চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানুষ। যেমন চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম দেরাদুনের তান্দুয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প কমান্ডারের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে। তখন শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল

আহমেদ, সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক কেন অনেকের মাঝখান থেকে হাসানুল হক ইনুকে এত বড়ো দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। সেই দায়িত্ব পালন করেছিলাম সাধ্যমতো। দুটি ঘটনাই আমার কাছে আশ্চর্যের এবং গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল, ব্যক্তিগত সম্পর্ক তেমন ছিল না। তিনিও ডাকেননি কখনো। আর সবশেষ তাঁর সঙ্গে দেখা জাসদ গঠনের আগে আগে ১৯৭২ সালের অক্টোবরে মিন্টো রোডের সুগন্ধায়। তখন জাসদ গঠনের প্রস্তুতি চলছে। সেসময়টায় মিন্টো রোডের সুগন্ধা নামে একটি সরকারি ভবনে বঙ্গবন্ধু সন্ধ্যায় বসতেন। মে মাসে কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে জাসদ গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের যাওয়া-আসা ছিল। সেখানে ছাত্রকর্মীরাও যেতেন। আমি তখন ছাত্র নই; কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবেই যেতাম। জাসদ হবে হবে কিছুদিন ধরেই একটা বিরোধ চলছে। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, সিরাজুল আলম খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন, কথা বলবেন, আমিও সিরাজুল ভাইয়ের সঙ্গে আছি। বঙ্গবন্ধু দোতলা থেকে নামছেন। আমরা সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো। তিনি আমাদের সামনে এসে খানিক দাঁড়ালেন, আমার গালে টোকা দিয়ে বললেন, 'ফুলের টোকা সহ্য হয় না রে, ফুলের টোকা সহ্য হয় না'। হাসতে হাসতে কথাটা বলে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চলে যান। এর অর্থ এই যে– আমরা বিরোধিতা করছি। এটাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার কাছাকাছি শেষ দেখা। আর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসায় গেছি কয়েকবার দেখেছেন, তখন হাত তুলে বলতেন, 'অ্যাই চা নাশতা খেয়ে যাস।' স্নেহবশত তুই করেই বলতেন।

প্রশ্ন: আপনাকে তো বঙ্গবন্ধু খুব স্নেহ করতেন। সম্মানও দিয়েছেন, তারপরও কেন বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে গেলেন?

হাসানুল হক ইনু: এটা সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক মতবিরোধ। জাসদ গঠন করার প্রয়োজন কেন হলো, এর কারণ রয়েছে। এটাও একটা ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাদের রাজনৈতিক বিরোধ হয়েছিল, এটা একটা ভিন্ন জায়গা, ইতিহাস এর মূল্যায়ন করবে। এটা নিয়ে আমি এই পরিসরে এর ব্যাখ্যা করতে চাই না। তবে এটুকু বলতে পারি, বাংলাদেশ কীভাবে গড়া হবে, বাংলাদেশ কোন পথে এগোবে–এমন একটা বিষয় নিয়ে মূলত বিরোধ হয়েছিল। এই বিরোধের মূল্যায়ন ইতিহাস করবে।

প্রশ্ন: আপনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন...

হাসানুল হক ইনু: নাহ, আমি মনে করি, এটা ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। বাংলাদেশ কীভাবে গড়া হবে, এ বিষয়ে আমাদের কিছু প্রস্তাব ছিল। আজ আর এ প্রসঙ্গে বলতে চাই না। এই পরিসরে বরং বঙ্গবন্ধুর দক্ষতা, দর্শন–এসব নিয়ে কথা বলতে চাই। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর কেন বিরোধ হয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টির কেন বিরোধ হয় এবং পরে আবার ঐক্য এবং কোন বিরোধের কারণে জাসদের জন্ম হলো–সেসব নিয়ে আরেকটি অধ্যায় হতে পারে। এসব এখন আলোচনা না করাই ভালো, তবে তা ইতিহাসে থাকবে। এটুকু বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না, আর্থিক বিষয় নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতও ছিল না। আমরা যারা জাসদ গঠন করেছি, তাদের যা বয়স ছিল, সেই বয়সে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনো পদ বা ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার ছিল না বা অন্য কোনো ধরনের বিরোধিতা ছিল না। কেবলই নীতিগত, দর্শনগত ও আদর্শগত বিরোধের কারণেই জাসদের জন্ম হয়েছে। মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রশ্নে। বঙ্গবন্ধু যে নীতি ও আদর্শে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যে চেতনার আলোকে বাহাত্তরে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা হলো– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ–এই চার মূলনীতির ওপরই আমরা অটল দাঁড়িয়েছিলাম। তাই এদিক থেকে বঙ্গবন্ধুর মতের সঙ্গে আমাদের কোনো মতের বিরোধ ছিল বলে মনে করি না। তবে এই নীতিগুলোর প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আমারা বিরোধে জড়িয়ে পড়ি এবং ওই পরিস্থিতিতে জাসদের জন্ম হয়।

আমরা মনে করেছি, সমাজতন্ত্রের ও বিপ্লবের পথে বাংলাদেশকে গড়ে তোলা বা টেনে তোলা যাবে। পুরোনো ধাঁচের ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণে তিনি খুব একটা সমর্থ হবেন না–এমনটাই মনে করেছি। পুরোনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বহাল রেখে সমাজতন্ত্রের পথে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবনাটা আমাদের হয়েছে তখন। তারপরও যখন এসব বহাল হলো, তখন আমরা হতাশ হলাম আর সেকারণেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং জাসদের সৃষ্টি। আমি জাসদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে জড়িত ছিলাম।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, জাসদ গঠনের সময় জাতীয় কৃষক লীগের ৮১ সদস্যের বেশির ভাগ জাসদে যোগ দেয়। শুধু তা-ই নয়, তখনকার ছাত্রলীগের ৮০ ভাগই জাসদকে সমর্থন করেছিল। শ্রমিক লীগের মোহাম্মদ শাজাহান খান ও রুহুল আমীন ভুঁইয়ার নেতৃত্বে অধিকাংশ নেতা ও সদস্য জাসদে যোগ দেন। পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়িয়েছিল। এভাবেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করি। আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি, সমাজতন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছি।

এটা ঠিক, জাসদ গঠন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ ছিল। জাসদ সেসময়ের সরকারের রাজনৈতিক বিরোধিতা করেছে, তীব্র সংগ্রাম করেছে, আন্দোলন করেছে, কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে পাঞ্জা ধরার চেষ্টা করেছে– এমনকি সশস্ত্র কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করেছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার থাকা দরকার–কখনই কোনো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেনি, এটা একটা দিক। অন্যদিকে ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার চিন্তা কখনো জাসদের মাথায় আসেনি। এই অভিযোগ কেউ দিতে পারবে না। যারা নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্য জাসদের দিকে আঙুল তুলেন, তারা ভুল কাজ করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় যদি বলি 'চাটার দল', আমি বলি–'ঘর কাটা ইঁদুর', যারা বঙ্গবন্ধুকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে। সেই ঘর কাটা ইঁদুরের দলের জন্যই বেইমান মোশতাক, কর্নেল ফারুক, রশিদ ও ডালিমের মতো ভাড়াটিয়া ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। আরও একটা বিষয় বলা দরকার–বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য এত টন কাগজে এতকিছু কারণ, সাক্ষীর বিবরণ লেখা হয়েছে, এর কোথাও জাসদের নাম লেখা হয়নি। কোনো সাক্ষীও বলেননি, ঘাতকও বলেনি যে এই হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে জাসদ।

প্রশ্ন: এই অভিযোগ তো কেবল আওয়ামী লীগের নয়, অনেকেরই?

হাসানুল হক ইনু: এই যে অনেকের কথা বলা হলো, এর পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রমাণ দিতে পারবে না তারা। তাছাড়া তখন সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধিতা করার দল জাসদই একমাত্র ছিল না। মওলানা ভাসানী ও অনেক শীর্ষ দলই বঙ্গবন্ধু সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী ছিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সব পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন শক্তি বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। পাকিস্তান ফেরত সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সরকারে বহাল করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তিনি তাদের বিশ্বাস করেছেন। যেখানে পাকিস্তানপন্থিরা সরকারে বাসা বেঁধেছিল।

প্রশাসনেও পাকিস্তানপন্থি অফিসাররা প্রশাসনের আসনে বসেছিল। একদিকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং বাংলাদেশের প্রশাসনে পাকিস্তানপন্থিদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে খোদ আওয়ামী লীগের ভেতরেও খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে বেইমানদের ষড়যন্ত্র; যার পরিণতিতে বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল নেতাকে প্রাণ দিতে হলো। সুতরাং জাসদের দিকে আঙুল তুলে লাভ নেই; বরং ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৬ আগস্টই জাসদ সভা করেছে। আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোশতাক সরকারের বিরোধিতা করবে। অথচ তখন বঙ্গবন্ধু সরকারের অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বঙ্গভবনে মোশতাকের আনুগত্য স্বীকার করেছে। জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এর প্রতিবাদ করেন। তাঁদের কারাবন্দি করা হয়। এই চার নেতা ও হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কোনো আওয়ামী লীগ নেতা তখন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে সেই সময় এগিয়ে আসেনি। কিন্তু জাসদ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করে। জাসদ তখন মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে লিফলেটও ছেড়েছিল। এর পরিণতি হলো, মোশতাক সরকারের ৮৩ দিনের শাসনামলে জাসদের অনেক নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়। মোশতাকের শাসনকালে জাসদের নেতাকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বরং আওয়ামী লীগের অনেকেই তখন মোশতাকের আনুকূল্য পেতে তদবিরে ব্যস্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন যে, ১৫ আগস্ট ৩২ নম্বরে সিঁড়িতে আমার বাবার রক্তাক্ত দেহটি পড়েছিল, কোনো নেতা সেদিন তাঁকে দেখতে যাননি! সুতরাং সমালোচকদের বলব, জাসদের দিকে আঙুল তোলার আগে আয়নায় নিজেদের চেহারাটা দেখুন।

জাতীয়তাবাদের জনক বলে মনে করি। এটা তাঁর বিশেষত্ব। কারণ, তিনি তাঁর মতো করে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছেন। পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু এই বিষয়টিকে দাঁড় করাতে পেরেছেন বলে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সুদৃঢ় ঐক্যের বন্ধন তৈরি হয়। বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার প্রশ্নটি সামনে আনার পর শক্তিশালী ঐক্যের বন্ধন তৈরি হয়।

১৯৪৮ সালের পর থেকে মুসলিম পরিচয়ের সংকীর্ণতা ও খণ্ডতা অতিক্রম করে পূর্ববাংলার জনগণ বাঙালি হয়ে উঠল। সেই আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতাবিরোধীরাও বলে থাকেন, হাজার বছরের যে বাঙালির ভূখণ্ড, এর স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন তিনি। বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করেছেন বঙ্গবন্ধু। অপবাদ দেওয়া হতো, বাঙালি বীরের জাতি নয়, সাহসী নয়, লড়াকু নয়। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হলো বাঙালি লড়তে জানে, অসম সাহসী, বীরের জাতি। জীবন দিয়ে স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ করেছে। এই বীরত্ব ও সাহস বাঙালির মনে জাগিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। আধুনিক জাতীয়তাবাদের জনক, যা হাজার বছরের একটি ফেনোমেনা, স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঙালিকে বীরের জাতিতে পরিণত বা

১৯৪৮ সালের পর থেকে মুসলিম পরিচয়ের সংকীর্ণতা ও খণ্ডতা অতিক্রম করে পূর্ববাংলার জনগণ বাঙালি হয়ে উঠল। সেই আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু

প্রশ্ন: বলা হয়, মোশতাক-পরবর্তী জিয়াউর রহমানকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে জাসদের ভূমিকা আছে?

হাসানুল হক ইনু: জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কোনো আপস নেই, তা হয়ওনি। জিয়াউর রহমান তো জাসদ নেতা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দিলেন। জিয়াউর রহমানের শাসনকালে জাসদের প্রায় অধিকাংশ নেতা জেলে কাটিয়েছে। হ্যাঁ, একটা সময় পরে নির্যাতিত হতে হতে প্রাণ বাঁচাতেই কিছু এলাকায় জাসদ কর্মীরা বিএনপিতে যোগ দেয়। তারা তো দল ত্যাগ করেছে। জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় জাসদের কর্মীরা তো ৮০, '৮১ সাল পর্যন্ত কারাগারেই ছিল। জেল খেটেছে। এটাই ছিল বাস্তবতা।

প্রশ্ন: আপনার মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব কোথায়?

হাসানুল হক ইনু: একটা বিষয় হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান কী, এটা যদি ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে দেখতে হবে এভাবে বাঙালি জাতিসত্তার চার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ধীরে ধীরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাম্প্রতিক কালের। যদিও এর শেকড় চার হাজার বছরের পুরোনো। বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির আধুনিক বাঙালির বীরত্ব জাগ্রত করা–এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অবদান। চার নম্বর হচ্ছে, বাঙালিকে সাম্প্রদায়িকতার আলখাল্লা থেকে মুক্ত করে বাঙালি পরিচয়েই প্রতিষ্ঠিত করা। অসাম্প্রদায়িকতাকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়ার কাজটি তিনি করেছেন। জাতীয়তা এক আর অসাম্প্রদায়িকতা ভিন্ন বিষয়–দুটিকেই ধারণ করতেন তিনি। এই চারটি বিষয়, যা আলাদাভাবে বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য অনেক কিছু। যা নির্দিষ্ট করে আলোচনায় কম আসে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে একজন মহান রাজনৈতিক কৌশলবিদ হিসাবে দেখি। সেটা হচ্ছে– তিনি গণ-আন্দোলন, গণসংগ্রাম, সশস্ত্রযুদ্ধ, শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ও নির্বাচন–এসবকিছুর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধনকারী। যা পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রনায়কই করতে পারেননি, তিনি তা করে দেখিয়েছেন। এসবই তিনি প্রয়োগ করেছেন একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য। রাজনীতির ইতিহাস ও সংগ্রামের ইতিহাসের এটি একটি ভান্ডার। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়–একটা ফরমান জারি করে একটি রাষ্ট্রের ভেতরে নতুন রাষ্ট্রের স্বশাসিত কাঠামো চালু করে দেওয়া, এটি একটি অপূর্ব রাজনৈতিক কৌশলই বলতে হবে। তা তিনি করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের সময়টাতে, ১৯৭১-এর ৮ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত

সময়টার কথা বলছি। এরপর তিনি ২৬ মার্চ ভোরে স্বাধীন বাংলা জাতিরাষ্ট্র গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দেন। স্বশাসিত রাষ্ট্রের যাত্রা করিয়ে দেন, কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে। এতে লাভ হলো এই যে, বাংলাদেশ নামের স্বাধীন দেশ ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের ভেতরে পাকিস্তান ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন হলো না। তাই ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে– এই বার্তাটিই বিশ্বকে জানানো ও বোঝানো গেল। ফলে নয়মাস যে যুদ্ধ হলো, তা স্বাধীন বাংলা জাতিরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের যুদ্ধ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হলো। তা বিশ্বের কাছে পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আক্রমণকারী দেশ ও তাদের বাহিনী হানাদার বাহিনী হিসাবে চিহ্নিত হলো। বিশ্ব জেনে যায়, নিরস্ত্র জনগণের ওপর আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এটা করলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের হিসাব অনুযায়ী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দক্ষতা দেখালেন তিনি, এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রশ্ন: বাঙালির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও বঙ্গবন্ধু বিষয়টি কিভাবে সমন্বয় করবেন?

হাসানুল হক ইনু: ৭ মার্চের ভাষণ। এই ভাষণের মূল্যায়ন করতে হলে কোন প্রেক্ষাপটে ৭ মার্চের ভাষণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, তা বুঝতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল ছিল সত্তরের নির্বাচন। সত্তরের নির্বাচনকে তিনি ছয় দফার পক্ষে গণরায়ে রূপান্তরিত করলেন। স্বশাসনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সেই নির্বাচনকে গণরায়ে পরিণত করলেন। সুতরাং যে মুক্তিযুদ্ধ করলাম, এর বিজয়টা সেই সত্তরের নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমেই পেয়েছিল বাঙালি। স্বশাসনের পক্ষে ব্যালট যুদ্ধে যে জয় হয়েছিল, তা পাকিস্তানিরা ছিনতাই করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙালির সেই বিজয়কে সুরক্ষার জন্য ২৬ মার্চ ভোরে স্বশাসিত জাতিরাষ্ট্র ঘোষণা করে নতুন রাষ্ট্র যাত্রা করিয়ে দিলেন। কেন করেছিলেন তিনি এটা? কারণ এর আগে বাঙালির বিজয় পাকিস্তানিরা ছিনতাই করেছিল। সে কারণে বাংলাদেশ তখন পূর্ববাংলা ও বাঙালিরা পিছিয়ে পড়েছিল। যেমন, ১৯৫৪ সালের শেরেবাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়কে ইস্কান্দর মির্জা ও আইয়ুব খানের ইয়াহিয়া সামরিক শাসনের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে বাঙালিকে দমন করে, যা ছিল পূর্ববাংলার বা বাঙালিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। এরপর দমিত বাঙালিকে বঙ্গবন্ধু যখন পঁয়ষট্টি ও পাক-ভারত যুদ্ধের পরে মোক্ষম সময়ে স্বশাসনের পক্ষে ছেষট্টিতে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, তখন পূর্ববাংলায় একটা গণজাগরণের সম্ভাবনা তৈরি হলো। আবারও বাঙালিকে দমন করতেই নেতা এবং ছয় দফার প্রণেতা বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার চক্রান্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার। বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে বন্দি করা হয়। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পাকিস্তানিদের এই চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়। এরপর সত্তরের নির্বাচনের বিজয়ের পরও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসন জারি, ১৯৭১-এর ১ মার্চ গণপরিষদের সঙ্গে বৈঠক স্থগিত করল, বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠনে বাধা সৃষ্টি করে–এটা হলো তৃতীয় চক্রান্ত। এমন প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ দেন। আবার অন্যদিকে তিনটা বিজয়– চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের বিজয়, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সত্তরের স্বশাসনের পক্ষে ভোটের বিজয়–পাকিস্তানিদের তিনটি বেইমানির আর চক্রান্তের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সামনে প্রশ্ন ছিল– আগের তিনটি চক্রান্তে বাঙালির অধিকার নস্যাৎ করেছিল পাকিস্তান সরকার, এবার কি চতুর্থ চক্রান্তের শিকার হবে বাঙালি? আবারও পিছিয়ে পড়বে নাকি সামনে এগোবে। সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যার জন্য ৭ মার্চ থেকে স্বশাসনের পক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন করে দেন। পূর্ববাংলার কর্তৃত্ব তিনি হাতে নিয়ে নেন। যাতে চক্রান্তের কারণে বাংলাদেশ আর পিছিয়ে না পড়ে, সত্তরের গণরায়ের পক্ষেই দেশ এগোতে পারে স্বশাসন ও স্বাধীনতার পক্ষে। নির্বাচনের বিজয়কে তিনি ছিনিয়ে নেওয়ার পথ বন্ধ করতে কৌশলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মূলত এই ভাষণে তিনি সত্তরের নির্বাচনের গণরায়ের পবিত্রতার পক্ষে কথাই বলেছেন। তিনটা চক্রান্তের প্রেক্ষাপটে ওনার কথা বলতে হয়েছে। তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ছিল বিরুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলছে সেসময়টায়। আমেরিকা ও চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ছিল। ভারতের সঙ্গে তখন বঙ্গবন্ধুর কোনো রাজনৈতিক চুক্তিও হয়নি। এমন একটি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে প্রমাণ করতে হয়েছে তিনি নিয়মতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক নেতা। বিচ্ছিন্নতাবাদ বা হঠকারী কোনো কাজ করেন না। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন–পাকিস্তানিরা অগণতান্ত্রিক, শাসনতন্ত্রবিরোধী, গণরায়বিরোধী একটি অপশক্তি। সুতরাং এমন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে ভাষণ দিতে হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণের আগে সারা দেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়, তাতে বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন ছিল। অন্যদিকে ভাষণ শুনতে যাচ্ছে মানুষ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি...' গাইতে গাইতে, আবার লাঠি, সড়কি হাতে নিয়ে। এটিও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাকিস্তানিদের আসন্ন আক্রমণকে মোকাবিলা করতে হলে নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্রযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে তৈরি হওয়ার বিষয়টিও তিনি তাঁর ভাষণে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই ভাষণটা পড়ে দেখলে বোঝা যাবে যে নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র করার মানসিকতা তৈরি, স্বশাসিত বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করিয়ে দেওয়া, স্বশাসিত বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে নিয়ে যাওয়া, পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা, পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক শক্তি বা বিশ্বকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখা, পাশাপাশি তিনি যে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া। এর সঙ্গে ছিল পাকিস্তানের তিনটি চক্রান্ত আর বাঙালির তিনটি বিজয়ের প্রেক্ষাপট। বাঙালির বিজয়কে রক্ষা করতেই স্বশাসিত রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়ে দেন ৭ মার্চ। এটা একটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক কৌশল, যা পৃথিবীর অন্য কোনো নেতার করতে হয়নি বা করেননি। নির্বাচনি রায় পকেটে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া–এটা তো সহজ কথা নয়। মাও সেতুং ও হো চি মিন গেরিলাযুদ্ধ করেছেন; কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারেননি। নেলসন ম্যান্ডেলা গেরিলাযুদ্ধ কিছুটা করছেন, শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনও করেছেন, কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ও আমেরিকার নেতা জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করেছেন; কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো যুদ্ধ এমনভাবে হয়নি। ১৯৫২ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শাসনতন্ত্রের ওপর জোর দিয়েছেন। গণসংগ্রামের কথাই বেশি বলা হয়। আমি মনে করি, তাঁর শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি এগিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, একাত্তরের ২৫ মার্চে তিনি পালিয়ে যাননি। একটি ক্যালকুলেটিভ পদক্ষেপ নিলেন। তা হলো, ২৫ মার্চে পাকিস্তান আর্মির আক্রমণের খবর পেলেন; কিন্তু তিনি তখন পালিয়ে না গিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। এতে তিনি প্রমাণ করলেন, তিনি শাসনতান্ত্রিক নেতা। আর অন্যদিকে এর মাধ্যমে

আন্তর্জাতিক শক্তি ও পাকিস্তানকে বিভ্রান্তের মধ্যে রেখেছেন। একদিকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, অন্যদিকে বাসা ছেড়ে যাননি। তিনি জানতেন যে, তাঁকে এ সময়ে হত্যা করা হলেও অনেক বেশি শক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ঠিকই চলবে। তাতে পাকিস্তানের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসবে আন্তর্জাতিক মহল থেকে। আর যদি তাঁকে বন্দি করে হত্যা করা হয়, তাহলেও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান পড়ে যাবে। সেসময়ে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও খুব ক্যালকুলেটিভ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁকে পাকিস্তানিরা মেরেও ফেলতে পারত, হঠকারী কাজটি করতেই পারত। বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেললেও শতগুণে বেড়ে মুক্তিযুদ্ধ হতো, স্বাধীনতার যুদ্ধ থেমে যেত না, এটা তিনি জানতেন। সারাবিশ্ব ও পাকিস্তানও দেখল তিনি একজন নির্বাচিত প্রাদেশিক নেতা নিরস্ত্র, গ্রেফতার হয়ে পাকিস্তানে চলে গেছেন। তিনি আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, আইনের মুখাপেক্ষী হলেন, পালিয়ে না গিয়ে বাসায়ই আছেন, গ্রেফতার এড়ালেন না। জীবনের ঝুঁকি নেওয়া তাঁর এই রাজনৈতিক কৌশলকে পেছন ফিরে দেখলে বোঝা যায়, শেষবিচারে এই কৌশলটা বাংলাদেশের কাজে লেগেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের কোনো ক্ষতি হয়নি, জীবিত শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ ফিরে পেয়েছে।

মুজিব জীবিত আছেন, তা ছিল বিশাল প্রেরণা সবার জন্য। কূটনৈতিক যুদ্ধেও তাঁর গ্রেফতার ও বন্দিদশা মুক্তিযুদ্ধের কাজে লেগেছে। অনেকবার তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। এখানে তিনি সাহসী ও মহান। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়া ও বন্দিদশা মুক্তিযুদ্ধের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদের মতো বিশ্বস্ত নেতাদের কাছে দায়িত্ব দেওয়া এবং জাতীয় সরকার ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের সব ব্যবস্থা করে যান তিনি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সেনাদের ফিরিয়ে দেওয়া।

> বঙ্গবন্ধু জানতেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রক্ষা করা বা পাওয়ার জন্য একটি ভৌগোলিক সীমানা ও স্বাধীন ভূখণ্ডই যথেষ্ট নয়। স্বাধীন রাষ্ট্র রক্ষায় প্রয়োজন নিজস্ব সংবিধান, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যলাভ এবং নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে এলেন। ভারতীয় সৈন্যদের দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সেসময়ের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন। বিষয়টি অন্যভাবে দেখি। স্বাধীনতা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন, তেমনই স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র রক্ষা করার সক্ষমতা প্রদর্শন করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা হয় নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী দিয়ে নিজস্ব পুলিশবাহিনী দিয়ে। এখানে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের ভূখণ্ডে যতক্ষণ থেকে যেত, বিশ্ববাসী দেখত যে বাংলাদেশকে রক্ষা করছে মূলত ভারতীয় বাহিনী। বঙ্গবন্ধু জানতেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রক্ষা করা বা পাওয়ার জন্য একটি ভৌগোলিক সীমানা ও স্বাধীন ভূখণ্ডই যথেষ্ট নয়। স্বাধীন রাষ্ট্র রক্ষায় প্রয়োজন নিজস্ব সংবিধান, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যলাভ এবং নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তিনি তো দেখেছেন আমেরিকা, চীন, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর বিরোধিতার মুখে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন এবং রাষ্ট্রের স্থায়ী বুনিয়াদ তৈরি করাটাকে প্রধান কাজ মনে করেছেন। বঙ্গবন্ধু সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতিসহ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের কাজও শুরু করেন দ্রুত সময়ের মধ্যেই। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্য হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করার পদক্ষেপ নেন। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী মিত্রবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেশের সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর কাছে দায়িত্ব দিয়ে ইতিহাসে এক বিরল নজির স্থাপন করেন। এসবই তিনি দ্রুতই করতে পেরেছেন।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর কোন দিকগুলো আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

হাসানুল হক ইনু: সেই সময়ের চলমান রাজনীতিতে এবং বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় স্বৈরাচার শক্তি বারবার আসছে শোষণ করতে, তখন তিনি যে বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দিয়েছেন যেমন–গণসংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নির্বাচন ও গণরায় সবকিছুকে সমন্বয় করার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, এতে আমরা চমকিত হই–এটা প্রভাবিত করেছে। স্বাধীন দেশে যদি স্বৈরাচারের উদ্ভব ঘটে এবং বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তখন যারা আন্দোলন করবে তারা বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ কেমন আছে বা কোন পথে চলছে...

হাসানুল হক ইনু: বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বলতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাহাত্তরের সংবিধানকে ধরে যদি চিন্তা করি–তিনি তো একটা সংবিধান দিয়ে গেছেন। তিনি যে বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, সেই সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছায়নি। এখনো অনেকপথ পাড়ি দিতে হবে। বিশেষ করে অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিটাকে মজবুত করা, বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ বা প্রসার ঘটানো, গণতন্ত্রের বিকাশ ও বৈষম্য কমানো–এখনো এই চারটি ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

প্রশ্ন: রাজনৈতিকভাবে বঙ্গবন্ধুকে চর্চা কতটা হয় বলে মনে করেন?

হাসানুল হক ইনু: বঙ্গবন্ধু যে জায়গাটায় বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়ে গেছেন, সেখানে বর্তমান বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর প্রণীত সংবিধানের চার নীতির আলোকে মেপে দেখব। সংবিধানের মূল চার নীতির অনুচ্ছেদগুলোর আলোকে দেখতে চাই। ৫০ বছরে বাংলাদেশের

অভিজ্ঞতায় এসে দেখতে পাই, আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ বোধের সংকট রয়ে গেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও চর্চা ও ধারণার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে, গণতন্ত্রচর্চার বিষয়েও সমস্যা এখনো বিদ্যমান। এসব সমস্যার ক্ষেত্রে যেসব কমতি ও ঘাটতি রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে কটিয়ে ওঠার অঙ্গীকার করা এবং সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়াই হবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চর্চার সার্থকতা।

প্রশ্ন: আগামী প্রজন্মের জন্য কী বলবেন?

হাসানুল হক ইনু: ১৯৭২-এর শাসনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশকে দেখে সেই অনুযায়ী দেশকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে কাজ করার আহ্বান থাকবে এই প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মের কাছে। বাংলাদেশ যেখানে এখন আছে, এখান থেকে এগিয়ে নিতে হলে আরেকটি জাতীয় উল্লম্ফন দরকার। মুজিববর্ষে দেখতে চাই জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণ। বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় চলতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে জাতীয়ভাবে। তাছাড়া বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নকে উন্নত ধাপে নিতে নয়টি ক্ষেত্রে জাতীয় উল্লম্ফন ঘটিয়ে শক্ত পাটাতন তৈরি করে দেওয়া যায়। নয়টি ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশের শাসন ও প্রশাসনে দুর্নীতি, ক্ষমতা দলবাজি, সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে, তা ধ্বংস করে সব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্য দিয়ে মুজিববর্ষকে সার্থক করা যেতে পারে। জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণকে উজ্জীবিত করা যায় এবং জাতীয় উল্লম্ফনের পথে হাঁটতে পারে বাংলাদেশ। রাজনীতি অঙ্গনের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে পঁচাত্তর-পরবর্তী যে রাজাকার সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী চক্র এবং তাদের দোসর বিএনপি, নব্য রাজাকার সাম্প্রদায়িক দল–এদের রাজনীতি থেকে বিদায় জানানো উচিত। এরাই হচ্ছে রাজনীতির বিষবৃক্ষ এবং রাজনীতিতে শান্তি বিঘ্নকারী। এসব দলের সঙ্গে রাজনৈতিক লেনদেন বন্ধ করা, বর্জন করা। সব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বর্জন এবং এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এসব দলকে গণতন্ত্রের নামে রাজনীতিতে আর কোনো ছাড় দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনার সময় এসেছে। পঁচাত্তর-পরবর্তী যেসব সামরিক শাসন ও সাম্প্রদায়িকতার পদচিহ্ন ও ছাপগুলো এখনো বিদ্যমান, সেগুলো দূর করতে শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে সংবিধান পর্যালোচনার সূত্রপাত করা দরকার মনে করি।

সবশেষে বলব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সম্মান দিতে হলে তাঁকে ছবিতে আটকে না রেখে তাঁর দর্শন ও আদর্শের চর্চা হোক। বঙ্গবন্ধু বাঙালির সংগ্রাম ও আদর্শের সোনার খনি। সেই সোনার খনি খুঁড়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, নৈতিকতা, সংগ্রামের কৌশল এবং তাঁর বাঙালিত্ব, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিচর্চা আবিষ্কার করে সমৃদ্ধ হোক বাঙালি।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

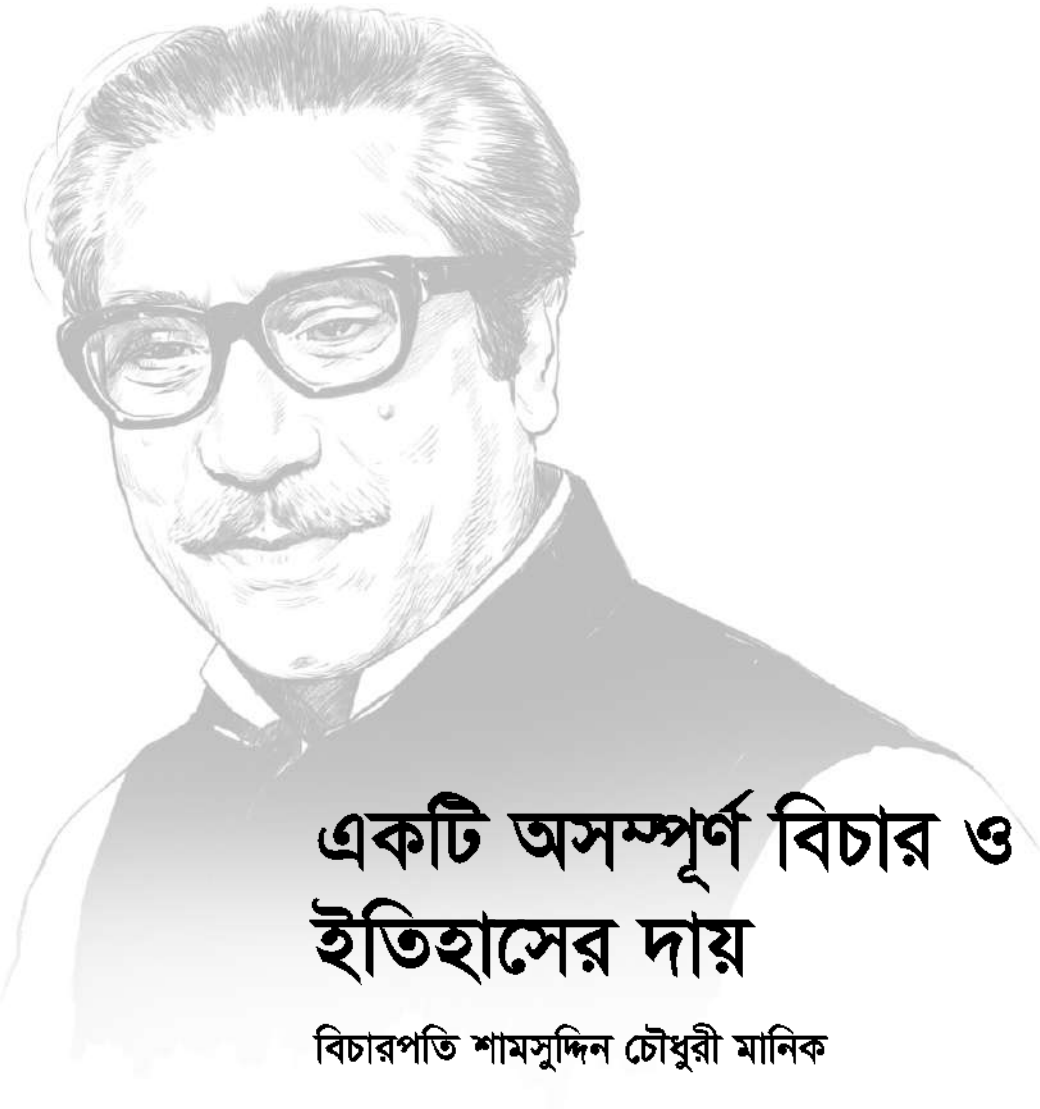

একটি অসম্পূর্ণ বিচার ও ইতিহাসের দায়

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

খ্রিষ্টজন্মের আগে এবং পরে গোটা বিশ্বে যেসব নৃশংস হত্যার ঘটনা ঘটেছে, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড সেগুলোর একটি। তবে এটি অন্যসব নৃশংস হত্যা থেকে আলাদা এই অর্থে যে, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট শুধু ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্যই এটি ঘটানো হয়নি, খুনিদের উদ্দেশ্য ছিল সেই আদর্শকে সমূলে নিঃশেষ করা, যার প্রতীক এবং প্রতিভূ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর রক্তের কোনো ধারক যেন বেঁচে না থাকে, এজন্য তাঁর ১০ বছরের শিশুসন্তানকে নির্মমতার চরম প্রকাশ দেখিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, যা কি না নজিরবিহীন। আরেকটি ব্যতিক্রমী দিক হলো–ওই হত্যাকাণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার তিন-তিনটি দেশ জড়িত ছিল।

বলা হয়, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে। কথাটি অর্ধসত্য। এটি ঠিক যে অতীতের সরকারগুলো, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রতিষ্ঠাতার হত্যায় জড়িত ছিল, তারা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে বিচারহীনতার যে নজিরবিহীন নগ্ন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল, বর্তমান

সরকার ক্ষমতায় এসে অন্তত প্রত্যক্ষ বন্দুকধারীদের বিচার করে সেই নির্লজ্জ অপসংস্কৃতি উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু একটি খুনের বিচারে শুধু বন্দুক বা অন্য অস্ত্র দিয়ে যারা খুনের কাণ্ডটি ঘটায়, বিচার শুধু তাদেরই হয় না, বিচার হয় সেসব কুশীলবেরও যারা হত্যার পরিকল্পনা করে, ষড়যন্ত্র করে এবং অস্ত্রধারীদের উসকে দেয়। মূলত আইন এবং বাস্তবতার নিরিখে পর্দার অন্তরালে থাকা এসব কুশীলবের দায়ই অধিক। কেননা, তাদের চক্রান্ত, উৎসাহ ও নির্দেশ ছাড়া প্রত্যক্ষ অস্ত্রধারীরা তাদের অপরাধ সংঘটিত করতে পারে না। আর এজন্য আইনেও কিন্তু এসব কুশীলবের বিরুদ্ধে অধিকতর সাজার বিধান রয়েছে। শুধু কয়েকজন মেজর, ক্যাপ্টেনই যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আসামি নয়, মূল কজন রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিই ছিল আসল ইন্ধনদাতা–জাতির কাছে সে কথা অজানা নয়। আর এসব ইন্ধনদাতার পরিচয়ও জাতির কাছে স্পষ্ট। এই স্পষ্টতা বেরিয়ে এসেছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় বিভিন্ন জনের সাক্ষ্য ছাড়াও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ থেকে।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় অন্তত তিনজনের সাক্ষ্য যথা: কর্নেল হামিদ, কর্নেল সাফায়েত জামিল, জেনারেল শফিউল্লাহর সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে ওই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে খুনি মোশতাক এবং খুনি জিয়ার প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল। কর্নেল হামিদের সাক্ষ্য প্রমাণ করেছে হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা আগে খুনি ডালিম এবং নূর খুনি জিয়ার সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাস এলাকায়ই একত্রে সময় কাটিয়েছে। খুনি ফারুক এবং রশিদ ছাড়াও অন্য আসামিরা যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে, তা থেকেও খুনি জিয়ার সম্পৃক্ততা পরিষ্কার। খুনি ফরুক-রশিদ শুধু লন্ডনের এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেই নয়, বরং ১৯৭৬ সালের ৩০ মে লন্ডনের প্রখ্যাত সানডে টাইমস পত্রিকায় এক নিবন্ধে খুনি ফারুক পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছে যে, তারা বঙ্গবন্ধু হত্যা পরিকল্পনা নিয়ে উপসামরিক প্রধান খুনি জিয়ার বাড়ি গেলে খুনি জিয়া তাদের বলেছিল চালিয়ে যেতে। অথচ জিয়ার আইনি দায়িত্ব ছিল তাদের পুলিশে দেওয়া। জিয়া সেদিন তাদের পুলিশে দিলে, আজ ইতিহাস অন্যরকম হতো। সেদিন ফারুক-রশিদকে পুলিশে না দিয়ে জিয়া রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ করেছিল, যার সাজা মৃত্যুদণ্ড। জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, এক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল তার বই 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য'-তে লিখেছেন, তিনি জিয়ার বাড়িতে মেজর ফারুককে দেখে হতভম্ভ হয়েছিলেন এবং জিয়াও এর সদুত্তর দিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর খুনি ডালিমসহ অন্য খুনিরা লিখা এবং বলার মাধ্যমেও প্রকাশ করেছে যে, হত্যাকাণ্ডে তাদের মূল অপশক্তি ছিল খুনি জিয়া। ২০২০ সালে সর্বশেষ ধরা পরা খুনি মাজেদ তার ফাঁসির আগে দেওয়া বিবৃতিতে একাধিকবার বলেছে যে, হত্যাকাণ্ডের মূল ক্রীড়নক ছিল জিয়াউর রহমান। বিশেষ করে খুনি মোশতাকের সঙ্গে যে খুনি শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান, চাষী, তাহের ঠাকুর, মোমেন খান, সাফদার, জেনারেল শিশুসহ অন্যরাও জড়িত ছিল, সে কথাও বিভিন্ন সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু জাতির জন্য চরম দুঃখের কথা হলো এই যে, এসব পর্দার আড়ালের খুনির বিচার হয়নি। যে কলঙ্ক আজও জাতি বয়ে বেড়াচ্ছে, যার জন্য বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকে অসম্পূর্ণ বিচার বৈ কিছু বলা যায় না।

খুনি মোশতাকের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ছিল; কিন্তু তার মৃত্যুর পর তাকে অভিযোগমুক্ত করতে হয়েছিল, কেননা আমাদের আইনে মৃত ব্যক্তির বিচারের বিধান নেই। একই কারণে খুনি জিয়া, খুনি চাষী, খুনি মোমেন খানসহ অন্য খুনিরাও মরে বেঁচে গেছে। কিন্তু জীবিত থেকেও কীভাবে খুনি তাহের ঠাকুর, তার বিরুদ্ধে অঢেল সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও বেকসুর খালাস পেল এবং কীভাবে হাইকোর্ট বঙ্গবন্ধু খুনের অন্যতম পরিকল্পনাকারী, খুনি রশিদের খুনি স্ত্রী মেহনাজ রশিদকে খালাশ দিলেন–এগুলো কিন্তু গবেষণার বিষয়। মেহনাজ রশিদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অকাট্য সাক্ষ্য ছিল যে, সে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পরই বঙ্গভবনে যে সভা ডেকেছিল খুনিরা, সে সভায় যে অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় ছিল সেই খুনি মেহনাজ রশিদ, তার ভূরি ভূরি সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল। এরপরও কীভাবে তাকে হাইকোর্ট মুক্তি দিলেন, একজন আইনজ্ঞ হিসাবে এবং সর্বোচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসাবে আমি তা বুঝতে অক্ষম। মুক্তির পরই মেহনাজ রশিদ পাকিস্তানে গিয়ে বর্তমান পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সেখানে থেকে বাংলাদেশবিরোধী কাজে ব্যস্ত।

> কিন্তু একটি খুনের বিচারে শুধু বন্দুক বা অন্য অস্ত্র দিয়ে যারা খুনের কাণ্ডটি ঘটায়, বিচার শুধু তাদেরই হয় না, বিচার হয় সেসব কুশীলবেরও যারা হত্যার পরিকল্পনা করে, ষড়যন্ত্র করে এবং অস্ত্রধারীদের উসকে দেয়

যারা মরে বেঁচে গেল, তাদের কী করা যায়–এ প্রশ্ন সবার। ১৬৪৯ সালের ৩০ জানুয়ারি ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ রাজা প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর ক্রমওয়েল ৬ বছর ইংল্যান্ড শাসনের পর ১৬৬০ সালে সে দেশে পুনরায় দ্বিতীয় চার্লসের নেতৃত্বে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমওয়েলের মৃত কঙ্কাল তার কবর থেকে তুলে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল প্রথম চার্লসকে হত্যার অপরাধে। বর্তমান ইংল্যান্ডেও এখন সেটি সম্ভব নয়। তবে খুনি জিয়া এবং খুনি মোশতাকের কঙ্কাল (যদি থেকে থাকে?) কবর থেকে তুলে ফাঁসিতে ঝুলানো হলে জনগণের এক বিরাট অংশ উৎফুল্ল হতো বৈকি? যাই হোক, এখন এসব পর্দার অন্তরালে থাকা কুশীলবদের যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ব্যাপারে কী করা উচিত, এ বিষয়ে বিজ্ঞজনদের মতামত হচ্ছে–অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা, যা কি না এসব পর্দার আড়ালের খুনিদের চিহ্নিত করবে এবং তাদের সম্পৃক্ততা যাচাই করবে। এরই মধ্যে আইনমন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে ইতিবাচক ঘোষণা দিয়েছেন; কিন্তু করোনা মহামারির জন্য এ পরিকল্পনা এগোচ্ছে না।

আমরা সবাই জানি পর্দার অন্তরালের খুনি কারা। কিন্তু এ ব্যাপারে একটি দাপ্তরিক দলিল না থাকলে তা আইনি স্বীকৃতি পাবে না। তাই সেই কমিশন তাদের প্রতিবেদনে যা লিখবে, সেটিই চিরকালের জন্য একটি অমূল্য আইনি দলিল হয়ে থাকবে, যার দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে জানবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা পর্দার আড়ালের খুনি কারা এবং আজ যেমন আমরা মীরজাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লব,

রায়দুর্লভ, ঘসেটি বেগম, মিরান প্রমুখকে ঘৃণা করি, ভবিষ্যতেও যুগ যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসব পর্দার পেছনের খুনিদের ঘৃণাভরে দেখবে। দেশের মাননীয় সাবেক প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম সাহেব পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে খুনি জিয়া, খুনি মোশতাক ও বিচারপতি সায়েমের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে তার রায়ে লিখেছেন, এসব ক্ষমতা জবরদখলদাররা দেশদ্রোহী, এদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম একজন অতি ঠান্ডা মাথার, ঠান্ডা চিন্তার লোক, একজন ব্যতিক্রমী ভদ্রলোক হিসাবে যার সুনাম রয়েছে। তিনিও জিয়া, মোশতাক ও সায়েম সম্পর্কে এ কথা লিখেছেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম এবং মাননীয় বিচারপতি (সে সময়ের) খায়রুল হক তাদের রায়ে ক্ষমতার জবরদখলদারদের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা বাস্তবায়নের জন্যই এই কমিশন অত্যাবশ্যকীয়। আর তা হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে। ২০১২ সালে তাহের হত্যা মামলার রায়ে এই ধরনের কমিশন গঠনের নির্দেশনা ছিল। কেননা, নেপথ্যের খুনিদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন এমন অনেকেরই এরই মধ্যে প্রয়াণ হয়েছে, বাকিরাও বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে, তাঁদের স্মৃতিও ম্লান হতে পারে সময়ের ব্যবধানে। খুনি জিয়া মুক্তিযুদ্ধকালে আসলে কী করছিল, সেটিও এখনো অনিশ্চিত। ২০১৩ সালে পাকিস্তানের প্রখ্যাত ডন পত্রিকায় এক সংবাদ ছাপা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৯ মে কর্নেল বেগ নামে পাকিস্তান সেনা গোয়েন্দা আইএসআই-এর এক কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানকে লিখেছিলেন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জিয়ার কর্মকাণ্ডে খুব খুশি এবং তাকে ভবিষ্যতে আরও বড়ো দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের যত্নসহকারে রাখা হবে। এই খবর থেকে প্রশ্ন উঠেছে, খুনি জিয়া আসলে '৭১ সালে কাদের সঙ্গে কাজ করেছিল। তদন্ত কমিশন সে দিকটিও তদন্তে আনতে পারবে।

কমিশনে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারা ছাড়াও খুনি ক্যাপ্টেন মাজেদের মৃত্যুপূর্ব বিবৃতিকেও বিবেচনায় নিতে পারবেন। সাক্ষ্য আইনে ডাইয়িং ডিক্লারেশন তত্ত্ব অনুযায়ী, যাকে সাক্ষ্য আইনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তদুপরি খুনি ডালিম প্রমুখদের লেখনী এবং সাক্ষাৎকারসমূহও বিবেচনায় নেওয়া যাবে, সাক্ষ্য নেওয়া যাবে জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, যিনি তার বই 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য'-তে লিখেছেন তিনি জিয়ার বাড়িতে মেজর ফারুককে দেখে অবাক হয়েছিলেন, জিয়াকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেও সদুত্তর পাননি। ব্যারিস্টার মওদুদ যেহেতু আর নেই, তার লিখনীও সাক্ষ্য আইনের বিধান বলে সাক্ষীতে নেওয়া যাবে, যে বইতে ব্যারিস্টার মওদুদ লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সঙ্গে জিয়ার যোগসাজশ ছিল। জিয়ার আরেক ঘনিষ্ঠজন ক্যাপ্টেন নুরুল হক তার বই, 'হাই টাইড, হাই টাইমে' যা লিখেছেন খুনি জিয়ার কার্যকলাপ নিয়ে, তা-ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে, সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ জিয়া যে পাকিস্তানি অস্ত্র খালাস করতে এগোচ্ছিলেন সে ব্যাপারে মেজর রফিক, এমনকি কর্নেল অলির সাক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাঘা সিদ্দিকী সীমান্ত পার হয়েছিলেন খুনিদের শিক্ষা দিতে, যাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে খুনি জিয়া ছিল প্রথম তালিকায়। এ ব্যাপারে তিনি বলতে পারবেন তিনি কাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নেওয়ার জন্য সেদিন ভারত গিয়েছিলেন? তাছাড়া এই কমিশন বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রে পাকিস্তান, চীন এবং নিক্সন-কিসিঞ্জারের ভূমিকাও তদন্ত করতে পারবে, মার্কিন সরকারের সেসব তথ্য যাচাই করে, যা অতীতে গোপনীয় থাকলেও এখন প্রকাশ করা হয়েছে, বিবেচনায় নিতে পারবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পত্রপত্রিকার খবর। এভাবে সাক্ষ্যের অভাব হবে না। কমিশনে একাধিক সদস্য থাকা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর ঋণ পরিশোধে, জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করতে আমাদের এই কমিশন গঠন এবং নেপথ্যের খুনীদের মুখোশ উন্মোচনের কাজটি করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। ইতিহাসের এই দায় এড়ানোর কোন সুযোগ আমাদের নেই।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

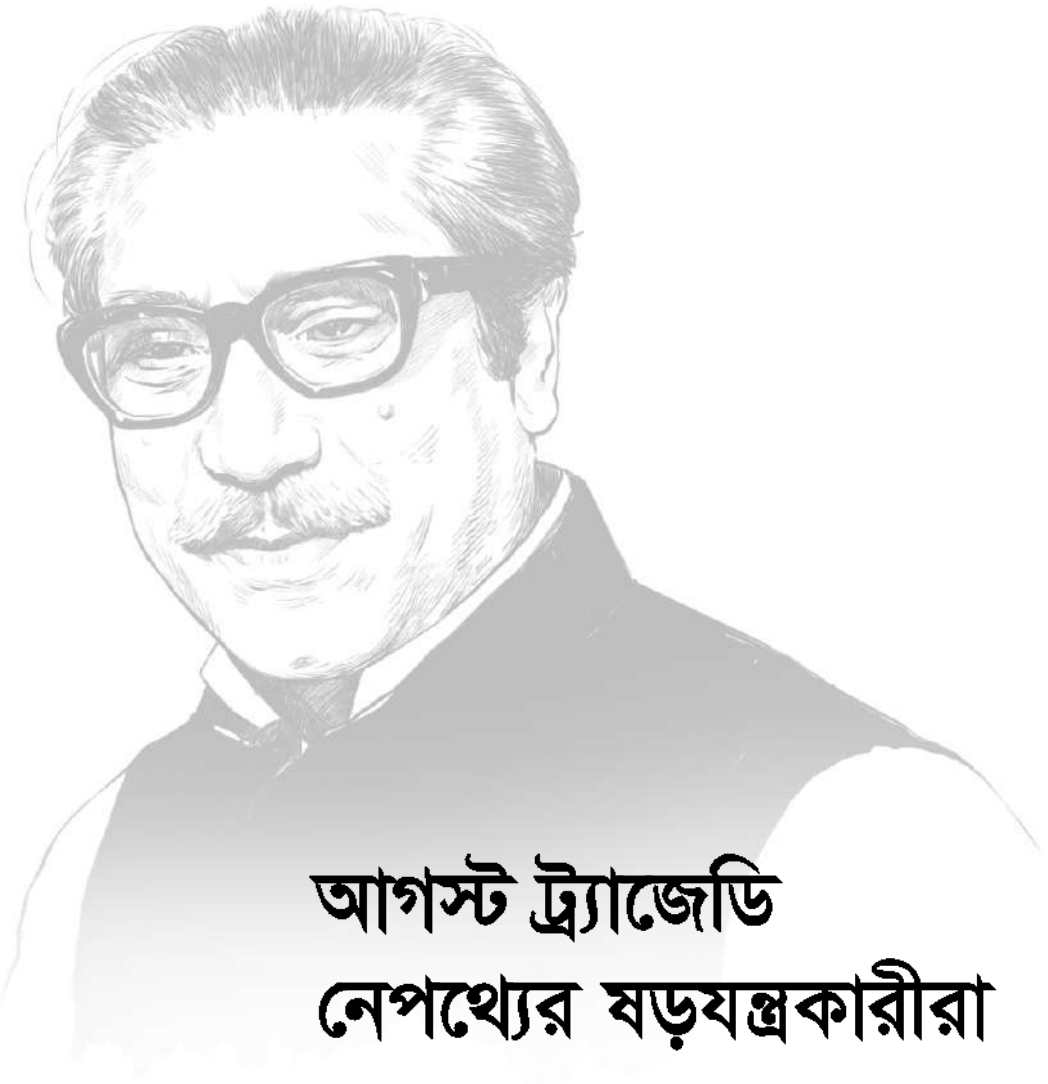

আগস্ট ট্র্যাজেডি নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীরা

মুহম্মদ শফিকুর রহমান, এমপি

এবারের আগস্ট ভিন্নমাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। বছরটি মহাকালের ইতিহাসের মহানায়ক বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বছরপূর্তি। এই স্মরণীয়-বরণীয় বছরটিতে কোভিড-১৯ বা করোনার নির্দয় উপস্থিতি মহামারি রূপ ধারণ করে গোটা মানবজমিন কবরস্থানে পরিণত করেছে। এরই মধ্যে অর্ধকোটির বেশি মানবসন্তান প্রাণ হারিয়েছেন। কোভিড কোথায় গিয়ে ঠেকবে বা এর শেষ কোথায়, তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই কেবল বলতে পারবেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই বিপন্মুক্তির।

আগস্ট ট্র্যাজেডির ওপর বিগত ৪৬ বছর অনেক আলোচনা হয়েছে, সেমিনার হয়েছে, সংবাদ হয়েছে, জার্নালিস্টিক কলাম লেখা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে, কতিপয় খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, খুনিদের কয়েকজন এখনো দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু নেপথ্যের খুনি

পরিকল্পনাকারী রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মুখোশধারীদের বিচার করা সম্ভব হয়নি। তারা চিহ্নিত নয় বলে রাজাকার-আলবদরদের মতো অনেকেই সমাজে সাদা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই দাবি উঠেছে উচ্চপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করে ওই বর্ণচোরা খুনিদের মুখোশ উন্মোচন করার। যাতে ওই খুনিদের নাম প্রকাশ্যে চলে আসে এবং বংশানুক্রমে সমাজে ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে। যেমন খুনি মোশতাকের লাশ তার গ্রামের বাড়ি দাউদকান্দি নিয়ে যাওয়ার সময় পথের দুধারে দাঁড়িয়ে মানুষ থুতু ছিটিয়েছে। ঘৃণা এড়ানোর জন্য লাশ মধ্যরাত শেষে নিয়ে যাচ্ছিল, তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। এখনো মীরজাফরের কবরে মানুষ পাথর ছুড়ে ঘৃণা প্রকাশ করে।

পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে দুইবার ফাঁসিতে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় বঙ্গবন্ধুর কারাকক্ষের পাশে কবরও খনন হয়েছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে হত্যা করার সাহস করেনি। এর অনেক কারণ আছে। বিশ্ববিবেক তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পক্ষে। ভারতের তৎকালীন মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর (ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী) ভূমিকা সবার আগে। '৭১-এর সেপ্টেম্বরে তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বর সামরিক জান্তার গণহত্যা ও ধর্ষণের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তির পক্ষে বিশ্ববিবেকের হৃদয়ে একটা চেতনা জাগিয়ে তোলেন। পাকিস্তানি জান্তা তাই আর সাহস পায়নি।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের মাটিতে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি এজন্য যে– পাকিস্তান চিরকাল এজন্য দায়ী হবে এবং দেশটির পেছনে যেসব পরাশক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, তারাও অভিযুক্ত হবে। অবশ্য তাদের সেই বোধ নেই। তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা থেকে বিশ্বের জনপ্রিয় এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জাতীয়তাবাদী নেতাদের হত্যা করে তাদের কিসিঞ্জারি শয়তানি অব্যাহত রেখেছে।

তৃতীয়ত, তারা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের মাটিতে হত্যা না করে বাংলাদেশের মাটিতে হত্যা এবং এজন্য বাঙালিদের বিশেষ করে আওয়ামী লীগকে দায়ী করার সুযোগ পাবে। তারা তাদের এ লক্ষ্য বিজয়ের সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশের মাটিতে কার্যকর করল। যে কারণে মির্জা ফখরুলরা আজও সেই ঢেড়া পিটিয়ে চলেছে।

চতুর্থত, মির্জা ফখরুলরা মোশতাকের কথা বলে আওয়ামী লীগকে দায়ী করলেও খুনি মিলিটারি জিয়াকে আড়াল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এই মিলিটারি জিয়া খুনি মোশতাকের মতোই নৃশংস নির্দয়। বরং বলা যায়, মোশতাকের চেয়েও এক পা এগিয়ে। যে কারণে ৩২ নম্বরের বাড়িতে উপস্থিত একজন মানুষকেও বাঁচতে দেয়নি। এমনকি শিশু শেখ রাসেল বা অপর বাড়িতে সুকান্ত বাবুর বুক গুলিতে ঝাঁঝরা করতে তাদের এতটুকু বুক কাঁপেনি। মূলত হত্যাকাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূলহোতা কিন্তু মোশতাক নয়, তাদের মূল লোক হলো মিলিটারি জিয়া। যে কারণে দেখা গেছে, ১৫ আগস্টের পর একটার পর একটা ক্যু করে রাজনীতির অঙ্গনকে বিশৃঙ্খল করে তুলে অতি অল্পদিনেই জিয়াকে সামনে নিয়ে আসে এবং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশকে আবার একটি মিনি পাকিস্তান বানানোর আয়োজন করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বাঙালি আর জাতির পিতার রক্ত যে মাটিতে, সে মাটি কাউকে ক্ষমা করেনি, করবে না। বঙ্গবন্ধুকন্যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেছে, বাংলাদেশ আজ কোনো সাম্রাজ্যবাদকে কেয়ার করে না, বরং এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। বিশ্ব এখন অবাক বিস্ময় বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। জাতির পিতা বেঁচে থাকলে হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী দশকে বাংলাদেশ আজকের অবস্থানে আসত। একটু দেরি হয়ে গেল, তারপরও শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এমন শক্তি নেই। দোয়া করি তিনি বেঁচে থাকুন বাঙালি জাতি এবং বঙ্গবন্ধুর 'আমার গরিব দুঃখী মানুষের' জন্যই, আল্লাহপাক তাঁর নেকহায়াত দান করুন।

মিলিটারি জিয়া যে মূল খুনি, তা তো যারা গুলি চালিয়েছিল এমন খুনিরাই বিদেশের মাটিতে গ্রানাডা টেলিভিশন ইন্টারভিউ দিয়ে বলে গেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পূর্বক্ষণে খুনিরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জিয়ার সঙ্গে দেখা করে। তাদের মধ্যে হত্যার আগে ও পরে যে কথা হয়েছে:

আমরা অভ্যুত্থান ঘটাতে চাই

"দাবি উঠেছে উচ্চপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করে ওই বর্ণচোরা খুনিদের মুখোশ উন্মোচন করার। যাতে ওই খুনিদের নাম প্রকাশ্যে চলে আসে এবং বংশানুক্রমে সমাজে ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে"

খ. I am a senior army officer. I can't involve directly, if you are serious, go ahead. এই I can't involve directly, এবং go ahead-এর অর্থ বোঝার জন্য পণ্ডিত হতে হয় না, মিলিটারি জিয়ার mental faculty তখন কী লালন করছিল, তা বোঝার জন্য জেনারেল হওয়ার দরকার নেই।

গ. হত্যাকাণ্ডের পর ভোর ৫টার মধ্যেই জিয়া ক্লিনশেভ করে ইউনিফর্ম পরে তৈরি ছিলেন। কেন? এ সময় যারা তার সাথে দেখা করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর দিলে জিয়া বলেছিলেন:

ঘ. So what, vice president is there

জিয়ার এসব মন্তব্য ১৫ আগস্টের পর থেকে আজও মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এক

এবার দেখব '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল। কারা ওইসব ঘটনার কুশীলব? গত ৫০ বছরে আমি আবিষ্কার করতে পারলাম না দেশ স্বাধীন হলো, অর্থাৎ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জিত হলো, ঠিক এর

তিন-চার মাসের মাথায় এমন কী কারণ ঘটেছিল যে জাসদের জন্ম হলো? প্রথমে জাসদ ছাত্রলীগ এবং পরে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল জাসদ?

প্রথম থেকে দলটির একটা সন্ত্রাসী চেহারা দেশবাসী দেখতে থাকল। দলের প্রধান হলেন রণাঙ্গনের এক সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল এবং সাধারণ সম্পাদক ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব। মেজর জলিলকে দলের প্রধান করে দলটি স্পষ্ট করে যে, এটি মিলিটারী গোষ্ঠীর একটি কর্মসূচি মাত্র। অবশ্য এর নেপথ্য নায়ক সিরাজুল আলম খান। তিনি নেপথ্যচারী বা কাপালিক নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। জাসদের নেতাকর্মীর কাছে দাদা। চেহারায় অবয়বে দাদাই বটে। লম্বা সাদা চুল তার চেয়ে লম্বা সাদা দাড়ি গোঁফ এসব তার ছদ্মবেশের আরেক রূপ। এতে করে তিনি নিজে প্রচণ্ড রকম এক বুদ্ধিদীপ্ত পলিটিক্যাল লিডার বা তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। কেউ কেউ মনে করতেন, সাদা চুল দাড়ি গোঁফের বনায়ন সৃষ্টি করে তিনি রবীন্দ্রনাথ হওয়ার চেষ্টা করতেন। তবে এতে তার চেয়েও বেশি সফল হয়েছেন বন্ধু কবি নির্মলেন্দু গুণ। পার্থক্য রবীন্দ্রনাথের মতো জুব্বা পরেন না।

দুই.

একদিকে জাসদের গণবাহিনীর তৎপরতা আল্ট্রা বামদের আঁধারের নৃশংসতা, তার ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কিসিঞ্জারি বুদ্ধি। একে একে মানুষের জীবন চলে যেতে থাকল। পাটের গুদামে আগুন, পেট্রোল পাম্পে বোমা, বিদ্যুৎকেন্দ্রে বোমা হামলা, ব্যাংক ডাকাতি এমনই সব নাশকতা শুরু হলো। আওয়ামী লীগের পাঁচজন এমপিকে হত্যা করা হলো। একজনকে তো ঈদের নামাজ পড়া অবস্থায় জামাতে গুলি করে হত্যা করা হলো। আর মওলানা ভাসানীর 'হক কথা' জাসদের 'গণকণ্ঠ' অলি আহাদের 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা ওই সব কর্মকাণ্ড ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকল। আ স ম আবদুর রব তার দলীয় সমাবেশে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এমন সব অশ্লীল অশালীন উক্তি করতেন যা কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তাদের গণকণ্ঠও ছিল হক কথার ডেইলি সংস্করণ। গণকণ্ঠে এমন সব রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ছাপা হতো, পড়তে শুরু করলে পুরো শরীর কাঁপত।

তিন.

হোম মিনিস্টারের বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা। কয়েক হাজার জাসদকর্মী হোম মিনিস্টারের মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে হামলা চালাল। গুলি ছুড়তে শুরু করল। ভেতর থেকেও গুলি চালানো হলো এবং তাতে কয়েকজন মারা গিয়েছিল শুনেছি। দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টার হিসাবে ওই ইভেন্ট কাভার করতে মিছিলের শেষভাগে হাঁটছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কী করব প্রথমদিকে বুঝতে পারছিলাম না। একপর্যায়ে লাফ দিয়ে রমনা পার্কের দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে ক্রলিং করতে করতে পার্কের দক্ষিণের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসি। পরে জানতে পেরেছি মিছিল থেকে প্রথম গুলি চালানো হয় উসকানি দেওয়ার জন্য। তারপরই ভেতর থেকে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়, তাতে কয়েকজন নিহত হন। ওই উসকানিটি কেন, কয়টা লাশ পড়ল, লক্ষ্য কী তবে ছিল লাশের ইস্যু বানানোর জন্য? এ প্রশ্ন রয়ে গেছে।

চার.

কিছু সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবীও যে নেপথ্য জড়িত ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যায়, তারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। একটি তথ্যে জানা যায়, পঁচাত্তরে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বাংলাদেশ করেসপনডেন্ট ছিলেন আতিকুল আলম। ১৫ আগস্ট খুনিরা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে প্রথম গুলিটি ছোড়ার অন্তত ১৫ মিনিট আগে একটি নিউজ ফ্ল্যাশ করে Bangladesh president sheikh mujibur rahman, who is also the founding father of the nation, was assassinated.....

প্রশ্ন হলো–গুলি করার ১৫ মিনিট আগে আতিকুল আলম কীভাবে জানলেন হত্যাকাণ্ডের কথা? এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না আতিকুল আলম আগেই জানতেন, কখন গুলিটি ছোড়া হবে? এমনটি ভাবা হলে কি কাউকে দোষ দেওয়া যাবে? হত্যাকাণ্ডের কয়েক মিনিট পর মিলিটারি জিয়াউর রহমানকে দেখা গেছে ক্লিনসেভ এবং আর্মি ইউনিফর্ম পরে আছেন যেন তিনি কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছেন।

পাঁচ.

এত বড়ো হত্যাকাণ্ডের জন্য নিশ্চয়ই বড়ো ধরনের একটা প্রস্তুতির কিংবা প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন পড়ে এবং তা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কিংবা আগামসি লেনে ঘটেছে। বিশেষ করে ক্যান্টনমেন্টে থেকে ট্যাংক কোনো অকেশন ছাড়া কেন বেরোলো, তা কেউ জানলো না। কোনো মিলিটারী অফিসারের মনে প্রশ্ন জাগলো না এমনটিও কি বিশ্বাস করতে হবে? জিয়ার স্ত্রী খালেদাও কিছু জানলেন না তা-ও বিশ্বাস করা যাবে?

যতদূর জানা যায়, খুনিরা ৩২ নম্বরের বাসভবনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আর্মি চিফ অব স্টাফ জেনারেল শফিউল্লাহ, ডেপুটি চিফ-অব-স্টাফ জেনারেল জিয়া এমন অনেককেই টেলিফোন করে সাহায্য চেয়েছেন কিন্তু কেউ আসেনি। কেবল কর্নেল জামিল এসে জীবন দিয়েছেন। জীবন দিয়েছেন আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেকেই। কেবল তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরপরই খন্দকার মোশতাক আমন্ত্রণ জানালে অনেকেই সুড়সুড় করে বঙ্গভবনে চলে যান এবং তাকে সমর্থন জানান। কেউ কেউ আওয়াজ করে সমর্থন না জানালেও মৌন সমর্থন ছিল। শুনেছিলাম কেবল একজন অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ছয়.

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন

সাত.

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মহসিন হলে ৭ ছাত্র খুন

আট.

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তোপখানা রোডে ইউসিস অফিসে মস্কো বামদের অগ্নিসংযোগ। পুলিশের গুলিতে ১ জনের প্রাণহানি।

নয়.

১৯৭৩-এর বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং খরা-বন্যা

দশ.

১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং বন্যাক্রান্ত অঞ্চলগুলোয় ফসলহানিজনিত দুর্ভিক্ষ যা কেবল প্রাকৃতিক ছিল না, অনেকখানি মনুষ্যসৃষ্ট ছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার তখন নগদ অর্থ দিয়ে চাউল কিনেছিলেন কিন্তু চাউলের জাহাজ চট্টগ্রাম মোংলা বন্দরে না ভিড়ে চলে

যায় বোম্বে বন্দরে। এটাকে যতই দিগ্‌ভ্রান্ত বলা হোক এটিও দুর্ভিক্ষ লাগানোর চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। কিসিঞ্জারের চক্রান্তও ছিল। তার তলাবিহীন ঝুড়ি বলাটা এমনি এমনি ছিল না।

এগারো.
এবার কিসিঞ্জারি চক্রান্তের দিকে একটু তাকাই। চক্রান্ত শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের মাঝে কলকাতায়। তখন মোশতাক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর মেজর জিয়া জেড ফোর্স প্রধান। তাদের সঙ্গে ছিল তাহের ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী গং। তারা মুজিবনগর সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করতে হলে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা লুজ কনফেডারেশন করা যেতে পারে। মোশতাক-জিয়া এমনও বলেছিলেন আপনারা বঙ্গবন্ধুকে চান না স্বাধীনতা চান। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উত্তরে বলেছিলেন, লুজ টাইট বুঝি না আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ও অর্জন করব, বঙ্গবন্ধুকেও মুক্ত করে আনব, ইনশাআল্লাহ। মোশতাক আরেকটি চক্রান্ত করেছিলেন জাতিসংঘের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কনফেডারেশনের কথা বলা যায় কিনা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এটি প্রকাশ পেয়ে গেলে তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

বারো.
বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিবেশ সৃষ্টিতে আরও অনেক ঘটনা আমরা ইত্তেফাকের নিউজ টেবিলে বসে শুনেছি। যেমন কখনো তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বিভেদ, কখনো শেখ ফজলুল হক মণির সাথে দ্বন্দ্ব এসব তখন ওপেন সিক্রেট ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাওয়ায় ওইসব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। অথচ তাঁরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁদের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না।

মোশতাক-জিয়া এমনও বলেছিলেন আপনারা বঙ্গবন্ধুকে চান না স্বাধীনতা চান। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উত্তরে বলেছিলেন, লুজ টাইট বুঝি না আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ও অর্জন করব, বঙ্গবন্ধুকেও মুক্ত করে আনব, ইনশাআল্লাহ

তেরো.
দৈনিক ইত্তেফাক কম ভূমিকা রাখেনি হত্যাকাণ্ডের পরিবেশ সৃষ্টিতে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ কাভার করার জন্য ইত্তেফাকের পক্ষে রংপুরে শফিকুল কবির ও আফতাব আহমেদ এবং ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা অঞ্চলে আমি ও রশীদ তালুকদার। অপর তিনজন আর জীবিত নেই। সেদিনের বাসন্তী দুর্গতির 'জালপরা ছবি' দুর্ভিক্ষের সিম্বল হয়েছিল এবং যা ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি বানোয়াট ঘটনা। বাসন্তীকে ১০ টাকা দিয়ে কবির ও আফতাব আহমেদ ওই অপকর্মটি করেছিলেন এবং দৈনিক ইত্তেফাক ফলাও করে সেটি ছেপেছিলও। পরে দৈনিক দেশ পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন ওবায়দুল হক। তিনি ওই ঘটনার ওপর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করেছিলেন, এটি ছিল বানোয়াট এবং ১০ টাকা দিয়ে বাসন্তীকে জাল পরিয়ে এই ছবি তোলা হয়েছিল। আমি এ ব্যাপারে ফটোগ্রাফার আফতাব আহমেদকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ওই ছবি ছাপা হওয়ার পর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য অনেক বেশি রিলিফ এসেছিল। এসময় রিপোর্টার আবেদ খানের ওপেন সিক্রেট ধারাবাহিকটিও পাঠকমনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছিল।

আরেকটি কথা, বাকশাল করার পর চারটি ছাড়া অন্য কাগজের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। চারটির মধ্যে ইত্তেফাক ছিল। তবে বন্ধ হওয়া দৈনিক বাংলা থেকে সব সাংবাদিক গিয়ে ইত্তেফাক দখল করে। আমাদের বসার জায়গাও ছিল না। আবেদ খান ও আমাকে পূর্বাণীতে অ্যাবজরভ করার জন্য ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের কাকরাইল চেম্বারে যাই। তিনি আমাদের বললেন, আপনাদের পূর্বাণীতে যেতে হবে না। আপনারা আপনাদের ইত্তেফাকেই থাকবেন। ঠিক তার এক সপ্তাহ পরেই ১৫ আগস্ট ঘটেছিল।

চৌদ্দ.
এই ঘটনাবলির সবই ছিল আগস্ট ট্র্যাজেডি ঘটানোর পরিবেশ সৃষ্টিতে কিসিঞ্জারি চক্রান্ত। আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কোনো ব্যক্তির শয়তানিকে মানুষ কিসিঞ্জারির চক্রান্ত বলত। কেন, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বেছে নিয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল।

১. বাকশাল দেশব্যাপী কাজ শুরু করলে হত্যার পরিবেশ থাকবে না
২. দুর্ভিক্ষের পর বঙ্গবন্ধু সরকারের বিনামূল্যে সার, বীজ, সেচ পাম্প, গভীর নলকূপ সরবরাহ করায় কৃষিতে বাম্পার ফলন এবং চালের কেজি দুর্ভিক্ষের সময় ৮ টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকায় নেমে আসে।
৩. বঙ্গবন্ধুর কেনা চাউলের জাহাজও হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে আসে।

এভাবে বঙ্গবন্ধুর দুর্ভিক্ষ-উত্তর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল মোশতাক-জিয়া পায়। ততদিনে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর চীন, সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিসিঞ্জারি চক্রান্তের আর কোনো উদাহরণ দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না।

এভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যদিও বঙ্গবন্ধু সহজে এর মোকাবিলা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসই করতেন না কোনো বঙ্গসন্তান তাঁকে হত্যা করতে পারে। কিসিঞ্জারি শয়তানরা হত্যাকাণ্ডটি ঘটায়। কিসিঞ্জারি শয়তানদের বিচার আজও হয়নি। হত্যাকাণ্ডের পর জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনেকের চেহারাও আমরা দেখেছি। শয়তানরা আজও চক্রান্ত করে যাচ্ছে। তাই তো দাবি উঠেছে উচ্চপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের।

৭ই আগস্ট ২০২১

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় প্রেস ক্লাব

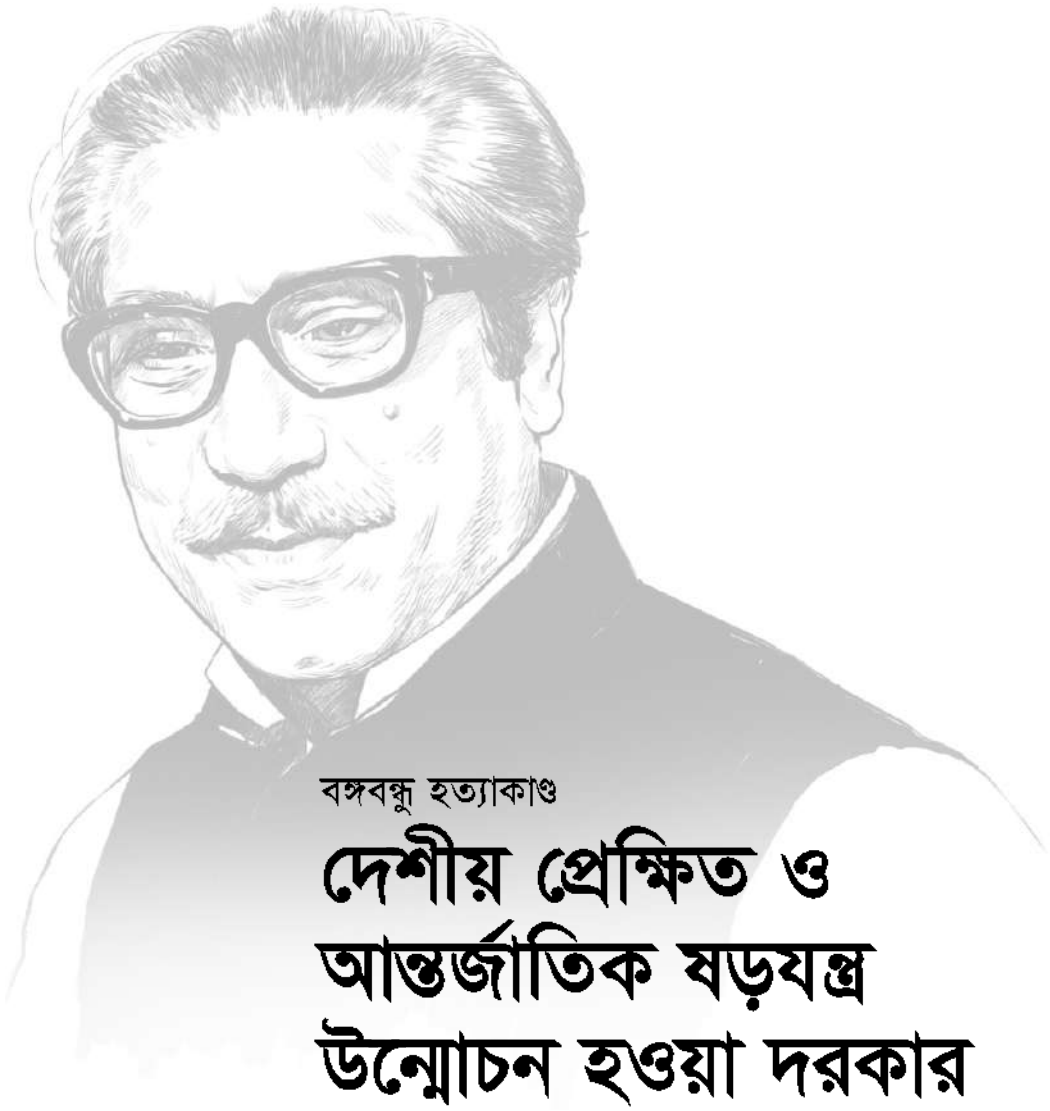

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

দেশীয় প্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র উন্মোচন হওয়া দরকার

শ্যামল দত্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার বিচার হলেও এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারী, দেশীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত নিয়ে কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ডের মতো এই নৃশংসতম ঘটনার বিচার হলেও এর নেপথ্যের বিষয়গুলো কার্যত উপেক্ষিত থেকে গেছে। দীর্ঘসময় পর হলেও বাংলাদেশের জাতির পিতাকে হত্যার দেশীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও প্রেক্ষিতের দিকটি উদ্‌ঘাটন করার জন্য এক ধরনের দাবি রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। যেহেতু রাষ্ট্রের নির্মাতাকে এরকম একটি নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যাত্রা শুরুর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় হত্যা করা হয়েছে। ফলে এই ঘটনার পেছনের দেশীয় রাজনৈতিক মদতদাতা ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্মলগ্নের ৫০ বছর পর এই প্রশ্নটি উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং এরকম একটি আকাঙ্ক্ষার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে। ইতিহাসের জঘন্যতম একটি ঘটনা নিয়ে

উত্থাপিত বিষয় অমীমাংসিত রেখে সমাজের অগ্রযাত্রা নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে বাধ্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পরপরই এরকম একটি নজিরবিহীন ঘটনার বিচারকাজ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটি হয়েছিল একটি অবৈধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর যে কোনো সভ্য রাষ্ট্রে যে কোনো অপরাধের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে জাতির পিতাকে হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল একটি কুখ্যাত 'অধ্যাদেশ' জারি করে। সভ্যতার ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন এক ঘটনা। একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার জন্য যারা দায়ী, তাদের কোনো বিচার করা যাবে না, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির হয়তো নেই। ফলে এই হত্যাকাণ্ড এবং খুনিদের রেহাই দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি চক্রান্তকারী গোষ্ঠী যে– এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল, সেটা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। এটাও বাস্তবতা যে, এই চক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ বা কোনো একটি ছোটো শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর পেছনে শক্তিশালী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা জড়িত ছিল এবং এই সত্যটি হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী বাস্তবতাই স্পষ্ট করে দিয়েছে। যেসব দেশ বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বীকৃতি দেয়নি, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর তারা স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী সরকারকে তারা নানা সহায়তা দিয়েছে। ফলে বোঝা যায়, এই ষড়যন্ত্র একদিনে হয়নি। পুরো হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি একটি দীর্ঘ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের সুকৌশলী চক্রান্তের ফসল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের খুনিদের বিচার বন্ধ করতে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী খন্দকার মোশতাক আহমেদের অবৈধ সরকার এবং এই অধ্যাদেশকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছিল তারই উত্তরসূরি সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯৭৯ সালের পার্লামেন্টে। সেনা শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান, স্বৈরাচারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামল ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের জন্য অনুকূল সময়। তারা সেই সময় রাষ্ট্রের আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছে। রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, এমনকি জাতীয় সংসদের আসন পর্যন্ত তারা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের এই কর্মকাণ্ডে দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতা যেমন ছিল, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমর্থনও ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর একটি বৈরী সময়কে বিচার উপযোগী করে তৈরি করার জন্য দীর্ঘসময় নিতে হয়েছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬–এই দীর্ঘ ২১ বছরে তৎকালীন সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবন্ধুর খুনিরা দেশে এবং বিদেশে অনেকখানি শিকড় গেড়ে বসেছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা এবং একটি গ্রহণযোগ্য বিচারের কাজ শুরু করাই ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। ফলে বাস্তবিক অর্থে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের দিকটি সেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে ওঠে আসেনি। অনেকেই মনে করেন, কোনো বিতর্ক সৃষ্টির যাতে সুযোগ তৈরি না হয়, সেজন্য আওয়ামী লীগ একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ডের মতো প্রচলিত প্রক্রিয়ায় বিচারকাজটি করতে চেয়েছিল। ফলে দীর্ঘ সময় নিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের কাজটি সম্পন্ন হলেও এর দেশীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের দিকটি বিচারের অনুসন্ধানের মধ্যে ওঠে আসেনি এবং বিচারকাজেও এই দুটি বিষয় প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও দেশীয় রাজনীতিতে যে ধরনের পরিবর্তন চলে এসেছে, তাতে এই ধরনের একটি অনুসন্ধানী প্রত্যাশার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্যতা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশগুলোর উল্লাস এবং মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য দেশীয় রাজনীতির যে মেরুকরণ ঘটেছে, তাতে অবশ্যই এই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে একটি তদন্ত হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের কোন কোন রাজনৈতিক শক্তি গোপনে গোপনে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে ইন্ধন দিয়েছে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যাকারীদের দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের জাল কীভাবে বিস্তার করেছিল, তা উদ্‌ঘাটন হওয়া প্রয়োজন।

সত্তরের দশকে বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে একান্তভাবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক চিন্তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য যে জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তা ছিল সেই সময়কার বিশ্ব রাজনৈতিক প্রবাহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত ও ভঙ্গুর অর্থনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য একটি শাসনব্যবস্থা দেওয়া ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্য। যে কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরুর অল্পদিন পরেই যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেখানে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অপরপক্ষ, যারা পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল একটি হুমকি এবং রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ ছিল একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। ফলে মুক্তিযুদ্ধে এই চিন্তার সমর্থকরা পরাজিত হলেও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা নিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পরপরই। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের উন্মোচন করা দলিল, বিভিন্ন বিদেশি গবেষকের লেখা ও পর্যবেক্ষণে দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উঠে এলেও এ নিয়ে বাংলাদেশের কোনো স্তরে কোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়নি। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলার তদন্ত চলাকালে এই বিষয়টিকে সামনে নিয়ে না আসায় যেসব হত্যাকারী ধরা পড়েছিল, তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য আদায় করা হয়নি।

"এটাও বাস্তবতা যে, এই চক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ বা কোনো একটি ছোটো শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর পেছনে শক্তিশালী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা জড়িত ছিল এবং এই সত্যটি হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী বাস্তবতাই স্পষ্ট করে দিয়েছে"

এটা বাস্তবতা যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং পাকিস্তানের সেই সময়কার সহযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তীসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও মনেপ্রাণে বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসাবেই তারা গ্রহণ করতে পারেনি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের পরবর্তী সময়ে যে বক্তব্য, তাতে সেটা স্পষ্ট। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ভূমিকা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণকারী চীন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। উলটো জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ভেটো দিয়ে বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়া বিলম্বিত করেছে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি। সৌদি আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরের দিন। ফলে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মেরুকরণ নানা ধরনের পর্যালোচনার দাবি রাখে।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তিগুলো বাংলাদেশ থেকে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, তাতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে এই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা নিয়েও বিশ্লেষণ হতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, দণ্ডপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর কয়েকজন হত্যাকারী এখনো পলাতক। কোনো কোনো হত্যাকারীর অবস্থান কোথায়, সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য এখনো জানা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের কেউ কেউ পাকিস্তানে অপ্রকাশ্যে এবং কেউ কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রকাশ্যে অবস্থান করছে বলে তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার যথাযথ উদ্যোগের অভাব আছে বলে অনেকেই মনে করেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনকালে এসব হত্যাকারীকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি আলোচনায় এলেও পরবর্তী সময়ে এ বিষয় নিয়ে আর কোনো অগ্রগতি দেখা যায় না। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার একযুগ পরও কোনো কোনো হত্যাকারী এখনো বহাল তবিয়তেই বিদেশে রয়ে গেছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সামগ্রিক বিষয়টি তদন্তের জন্য আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক পর্যায় থেকে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি উঠলেও রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার যতক্ষণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যায় দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উন্মোচনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ এ বিষয়টি অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে বলেই মনে হয়। কারণ, দেশের মানুষের বিশ্বাস–বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, ৩০ লাখ শহিদের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা নিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভবকে বিনষ্ট করা এবং পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চিরতরে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র ও অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়–স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর পরও জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো আড়ালেই থেকে গেল।

লেখক: সম্পাদক, ভোরের কাগজ

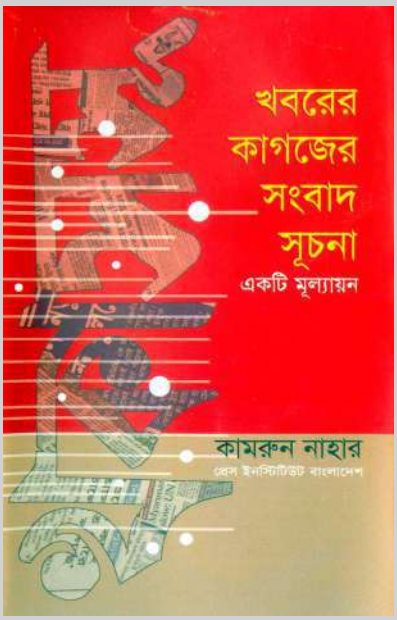

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

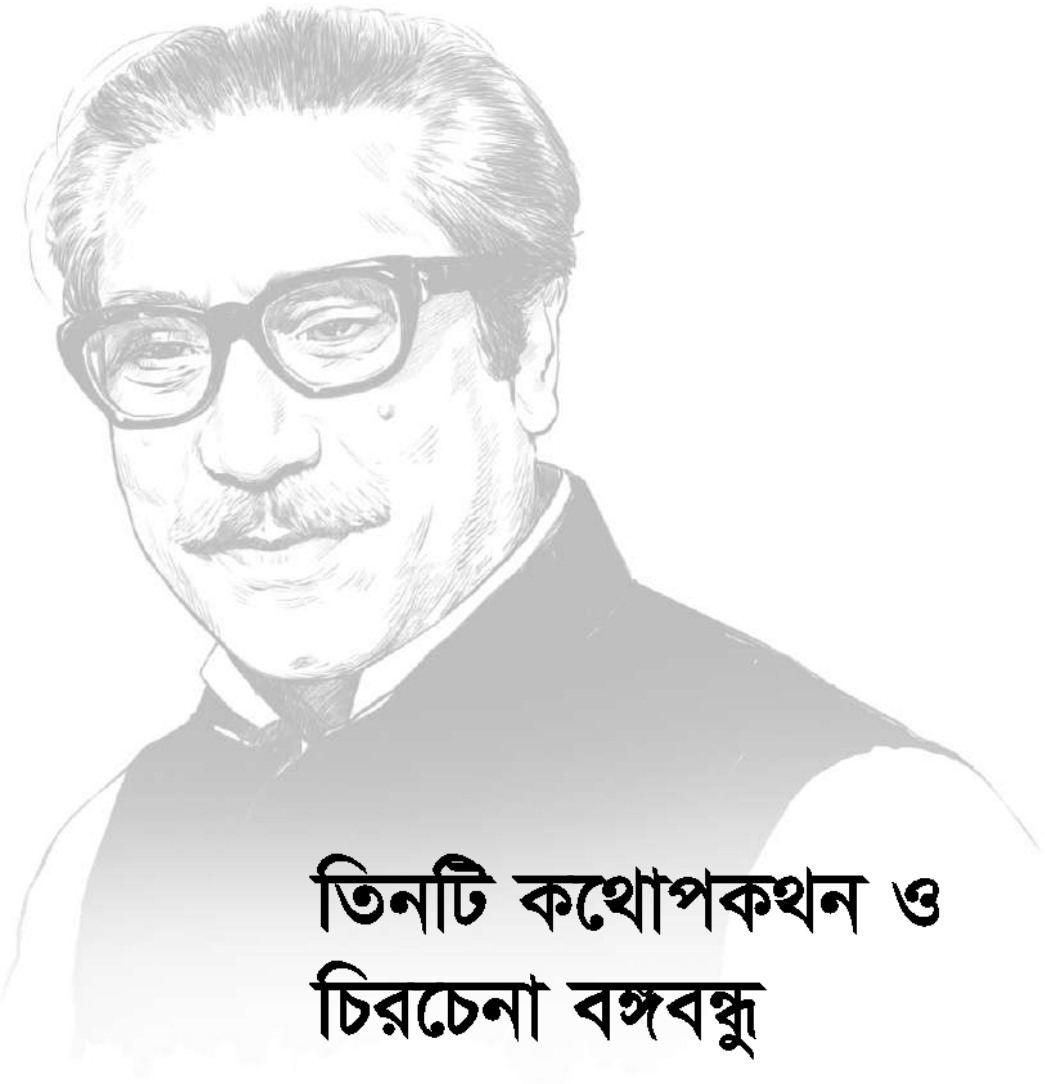

তিনটি কথোপকথন ও চিরচেনা বঙ্গবন্ধু

রেজা সেলিম

যারা বলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশ পরিচালনার শেষের দিকে মার্কিন নীতির কাছে নিজেকে প্রায় সমর্পণ করেছিলেন, সেসব অলীক প্রচারণার জুতসই জবাব আছে খোদ মার্কিন দলিলপত্রেই। একটু কষ্ট করে নতুন প্রজন্মকে সেগুলো পেতে খুঁজে বের করে নিতে হবে। কারণ, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকেই দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশকে এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার খুঁটিনাটি প্রমাণগুলো জেনে এখন প্রকাশ করা দরকার যাতে স্বাধীনতাবিরোধী ও অপশক্তির ক্রমাগত সম্মিলিত উদ্যোগে বাধা দেওয়া যায়। এটা অনেকটা অপর একটি মুক্তিযুদ্ধের মতোই। আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হলে তাকে পাহারা দিয়েই রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোর্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার এবং একজন মার্কিন কূটনীতিকের ম্লান হয়ে যাওয়া অন্তত তিনটি কথোপকথন ঘটনার উল্লেখ করে আজকের এই রচনা।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের পরও কেন জাতিসংঘে পৌঁছাতে এতদিন বিলম্ব হলো, সে অন্বেষণও জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নাম বহুবার আলোচিত হয়েছে জাতিসংঘের দরবারে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে রাশিয়ার ভেটো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেছিল। অথচ জাতিসংঘে চীন সদস্যপদ পায় ১৯৭১ সালে, যারা ২৫ বছর আগে আবেদন করেও সদস্যপদ পায়নি। সেই চীন ও তার অক্ষশক্তির হস্তক্ষেপই মূলত বাংলাদেশের সদস্যপদপ্রাপ্তিকে দীর্ঘায়িত করেছিল। বঙ্গবন্ধুর অবিচল কূটনৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশ মাত্র দুই বছরে চীন ও তার সেই অক্ষশক্তিকে দুর্বল করতে সমর্থ হয়েছিল।

সদস্যপদ পেয়ে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগ দেয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। ৩০ সেপ্টেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর হোটেলে দেখা করতে যান। নিউইয়র্কের ওয়ার্ডড্রফ টাওয়ারে বঙ্গবন্ধুর সুইটে এই সাক্ষাতে কিসিঞ্জারের সঙ্গে ছিলেন মার্কিন সরকারের তিনজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হোসেন আলী। কিসিঞ্জারের সঙ্গে যে তিনজন ছিলেন তাদের একজন পিটার কনস্টেবল। যিনি এই সাক্ষাতের নোট নিয়েছিলেন, যা এখন মার্কিন দলিলপত্রের আর্কাইভে উন্মুক্ত। তাতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু কিসিঞ্জারের সঙ্গে এই সাক্ষাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন অবিচল নেতার মতোই আচরণ করেছেন, যেখানে কিসিঞ্জার কখনো কখনো হোঁচট খেয়েছেন।

কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী আলোচনা শুরু করলেও (I am very pleased to meet you and to welcome you to the United States) কিসিঞ্জারকে দেখা গেছে বঙ্গবন্ধুকে খুশি করার চেষ্টা রাখতে–যেমন তিনি বলছেন, 'It is a great pleasure to see you here. In 1970 when Yahya Khan was here for the UN, he explained to me why the elections in Pakistan would be well manipulated. He said there were 20 parties in East Pakistan. There would be no majority party and Yahya would therefore have an excellent opportunity to maneuver to control the situation. Then of course you achieved your spectacular majority, with 167 out of 169 seats in East Pakistan. Ever since then I have never believed political predictions, unless of course you make them' (বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে কিসিঞ্জার বলছেন, 'আপনাকে এখানে দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দ লাগছে। ১৯৭০-এ জাতিসংঘে যোগ দিতে ইয়াহিয়া খান যখন এখানে আসেন, তিনি আমাকে বোঝান, পাকিস্তানে নির্বাচনকে কেন তাঁর পক্ষে কাজে লাগানো যাবে। তিনি জানান, পূর্ব পাকিস্তানে ২০টি দল আছে, কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে না। তখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার একটা সুযোগ পাবেন ইয়াহিয়া। এরপর তো পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতে আপনি নাটকীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন। এরপর থেকে রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি আর বিশ্বাস করি না...')।

উত্তরে বঙ্গবন্ধু খুবই দৃঢ়, বললেন, 'নির্বাচনের আগে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ৯০ শতাংশ ভোট পাব কি না। বলেছিলাম, ৯৭ শতাংশ পাব। আমি এত নির্বাচন করেছি যে অবশ্যই আমি ইয়াহিয়ার চেয়ে ভালো জানি। তার আইডিয়া, কর্মকৌশল আমি ভালোই বুঝি... (I gave my prediction before the election at a press conference in Dacca. I was asked if I would get 90% of the votes. I said I would get 97%. Of course, I have contested so many elections that I knew better than Yahya. I understood his ideas and plans to maneuver)।

প্রত্যুত্তরে কিসিঞ্জার যোগ করেন যাতে বঙ্গবন্ধুকে খুশি করার চেষ্টা দেখা যায়, "ফলাফল কী হবে, তা যদি সে জানত, তাহলে কোনো নির্বাচনই হতো না। চীন যাওয়ার পথে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, আমার জন্য যে সফরের ব্যবস্থা সে করেছিল। আমার সম্মানে সে একটা ডিনার দিয়েছিল, টেবিলে আমাকে বলল, 'লোকে আমাকে একনায়ক বলে।' তারপর সবাইকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'আমি কি একনায়ক?' সবাই বলল, 'না।' তারপর

> মার্কিন এই দলিল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতিটি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু কী অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু তাঁর গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ সব উন্নত দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই সহযোগিতা কামনা করেন

আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বললাম, 'আমি ঠিক জানি না। তবে একজন একনায়ক হিসাবে খুবই বাজে একটা নির্বাচন করেছেন আপনি।"

যদি কেউ নিবিষ্টমনে এই দলিল নিরীক্ষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন বঙ্গবন্ধুর সাথে কথোপকথনে কিসিঞ্জার কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ আতিথেয়তায় কিছু খাবে কি-না জানতে চাইলে কিসিঞ্জার চা খেতে চান। বঙ্গবন্ধু চা পরিবেশনের ইঙ্গিত করে বলেন, 'আমরা কিন্তু চা উৎপাদন করি।'

এই সাক্ষাতে কিসিঞ্জার ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দুই দেশের সম্পর্ক, উন্নয়ন সহায়তা ছাড়াও আরও বেশকিছু বিষয়ে আলোচনা হয়, যার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে আমার দেশে মার্কিনবিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। কিন্তু এখন দেশের মানুষ মার্কিনিদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার বলেন, "বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন আপনি। পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলা এবং তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করার প্রবল প্রলোভন নিশ্চয়ই ছিল। বাঙালিদের প্রতি বরাবরই আমরা ভীষণ সহানুভূতিশীল... 'It is a natural friendship on our side'–কিসিঞ্জার এরকম কথা বললেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার মনোভাব কী ছিল, ইতিহাস সে সাক্ষী দিয়েছে।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে কিসিঞ্জার বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, চীনাদের ব্যাপারটা কী? তারা আপনার দেশে নাশকতামূলক কিছু কি করছে? এত দিনে আপনাদের সম্পর্ক হয়েছে কি? জবাবে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট স্বরে বলেন, 'Not yet. We know each other. I went to Peking in 1958 and they came to Dacca in 1962. I want friendship with China but we have our self-respect. I can offer friendship but the initiative has to come from them also'। কিসিঞ্জার এ সময়ে ইঙ্গিত করেন, চীন সম্ভবত আগামী বছর (হিসাবে '৭৫-এর মাঝামাঝিই হয়) থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা শুরু করবে।

বাঙালিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে একপর্যায়ে কিসিঞ্জার মন্তব্য করেছিলেন, 'বাঙালিরা বিদ্রোহী জাতি। হার্ভার্ডে তোমার পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আমার অনেক ছাত্র ছিল, যাদের আমি জানি।' এই বিদ্রোহী ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের কেমন করে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে, বঙ্গবন্ধু তা উল্লেখ করে বলেন, পাকিস্তানি জেনারেল ফরমান আলী খান একটা চিরকুটে লিখেছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ মাটিকে লালে রঞ্জিত করে তুলতে হবে।' ওটা আমরা পেয়েছি, যা সবিস্তারে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের অন্যায় ভূমিকা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সময়োচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করে কিসিঞ্জারকে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিরও ধারণা উল্লেখ করেন, যা কিসিঞ্জারের জানা দরকার ছিল। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'We have a foreign policy that is neutral, non-aligned and independent'.

পরের দিন ১ অক্টোবর বেলা ৩টায় আমন্ত্রিত হয়ে বঙ্গবন্ধু হোয়াইট হাউজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলাপের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু মিসেস ফোর্ডের শারীরিক অসুস্থতার খবর নেন ও বিস্ময়করভাবে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড বঙ্গবন্ধুকে বিস্তারিত অবহিত করতে শুরু করেন। ফোর্ড জানান, 'It was a shock to us. We had to make the decision for the operation, then wait for them to determine malignancy, and so forth'. ফোর্ড এ সময় বঙ্গবন্ধুকে জানান যে, মিসেস ফোর্ডের শরীরে ৩০টির মতো নোড (এক ধরনের টিউমার) শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে দুইটি ইতোমধ্যে ক্যান্সার বলে চিহ্নিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এ সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন, যদিও প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এ বিষয়ে তাঁর নিজের উদ্বেগের কথাও বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন।

কূটনৈতিক জগতের বন্ধুদের কাছে শুনেছি এরকম ব্যক্তিগত তথ্য সাধারণত খুব ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে প্রকাশ হয় না বিশেষিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেলায় তো নয়ই। দলিলসূত্রে লক্ষণীয় যে, ওভাল হাউজের বারান্দায় ফটো সেশনের পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথোপকথন শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধুর মতো ব্যক্তিত্বের সামনে দুই মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়া, যিনি কি না বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়ো ছিলেন গড়গড় করে তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তথ্য শেয়ার করছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড যখন বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সরকারপ্রধানের সাক্ষাৎ হলো, তখন বঙ্গবন্ধু তাঁর জবাবে বলেন, 'হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে আমার জনগণের জন্য কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছি' (Yes. I am happy to have the opportunity to talk with you about my people)।

মার্কিন এই দলিল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতিটি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু কী অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু তাঁর গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ সব উন্নত দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই সহযোগিতা কামনা করেন। একপর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড বাংলাদেশের পাট উৎপাদন সম্পর্কে জানতে চান এবং আন্তর্জাতিক ঋণ সহায়তা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চান। বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাংকসহ অন্যদের সঙ্গে আলাপ চলছে জানান।

ফোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় বঙ্গবন্ধু কখনো কাঁচুমাচু করে কিছু চেয়েছেন এমন তথ্য নেই। যদিও পরের সরকারের সঙ্গে নানা আলোচনায় মার্কিন দলিলে এরকম তথ্য আছে যে, মার্কিনিদের খুশি করতে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপ্রধান অস্ত্র কিনতে আগ্রহী বলে চিঠি দিয়েছিলেন, যা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে কৌতূহলী করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়চিত্তে তাঁর দর্শন ব্যক্ত করার বক্তব্য পাওয়া যায় বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজেন বোস্টারের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে। হত্যাকাণ্ডের মাত্র দিন দশেক আগে ৫ আগস্ট ১৯৭৫ বোস্টার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের দুজনের আলোচনার যে প্রতিবেদন ওয়াশিংটনে পাঠান, সেখানে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু বলছেন, 'আমি মার্ক্সিস্ট নই। আমি একজন সমাজতান্ত্রিক; কিন্তু সেটা আমার নিজস্ব পথে। আমি সব দেশের বন্ধু হতে চাই; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কোন দেশ ভাবুক আমাকে কী করতে হবে, সেটা সে বলে দেবে' (I am not a Marxist. I am a Socialist, but a Socialist in my own way. I want to be friends with all countries but I don't want any country to think it can tell me what to do'। তৃতীয় বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর মুখেই এমন উচ্চারণ মানায়।

এখন সময় হয়েছে প্রকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই করে মূল দলিলগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে বের করে আনা। নতুন প্রজন্মের দেশপ্রেমিক সবার দায়িত্ব বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু–এই তিনের সমন্বিত যে ইতিহাস, তা অবিকৃত করে তুলে ধরা। বাংলাদেশের মানুষ কখনো মাথা নিচু করেনি, এটা বিদ্রোহের জাত এবং সে জাতির নিজস্ব উন্নয়ন দর্শন রয়েছে, যার মূল প্রোথিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে, আমাদের সেসব জানতে হবে ও জানাতে হবে।

লেখক : কলামিস্ট এবং পরিচালক, আমাদের গ্রাম গবেষণা প্রকল্প

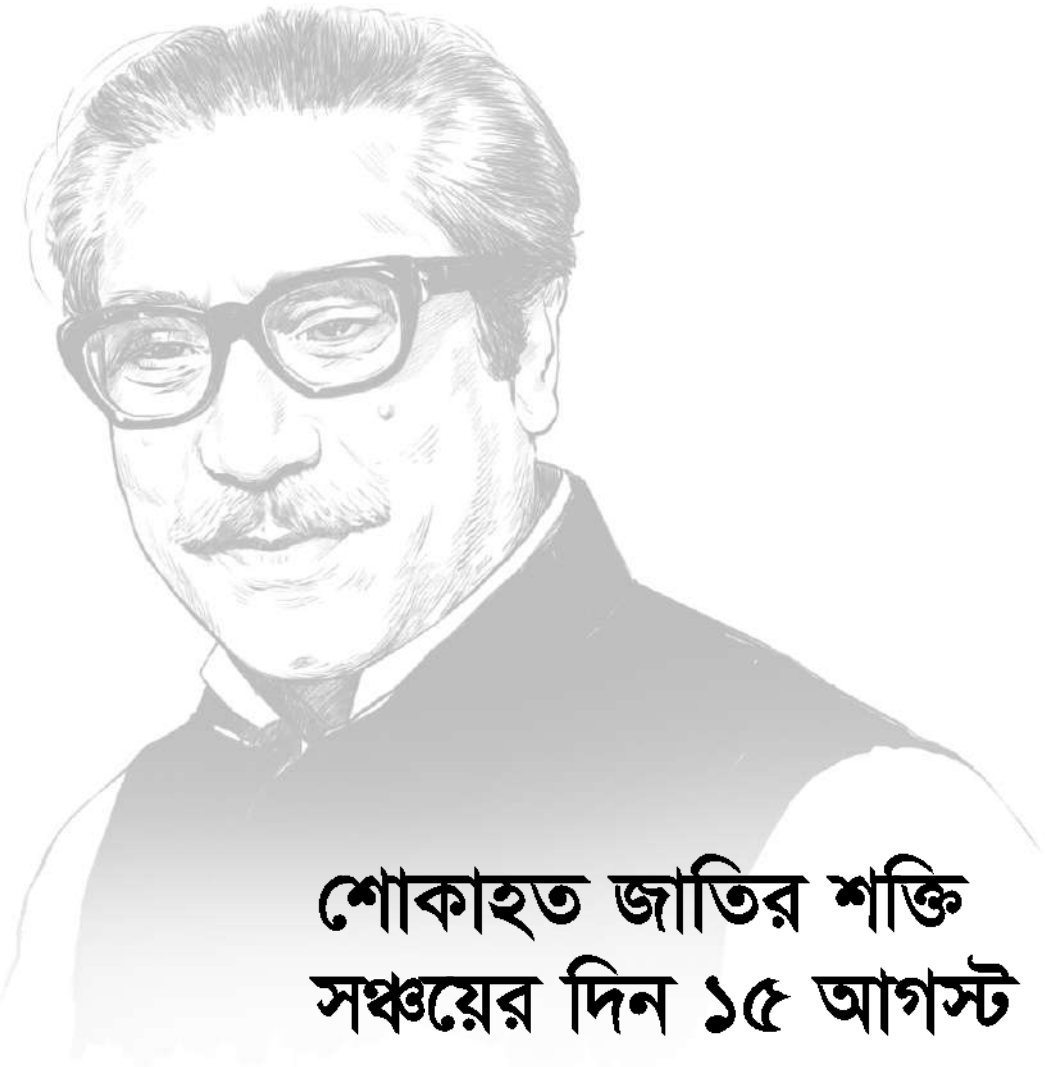

শোকাহত জাতির শক্তি সঞ্চয়ের দিন ১৫ আগস্ট

মোল্লা জালাল

১৫ আগস্ট বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য শোক ও শক্তি সঞ্চয়ের একটি দিন। এদিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এটি ইতিহাসের সব নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্বরতাকে ম্লান করে দিয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত হয়েছে। কারণ, বঙ্গবন্ধু হত্যা কেবল একজন ব্যক্তির খুন নয়। এই হত্যাকাণ্ড একটি দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার গভীর চক্রান্তের ফসল। এখানে তিন পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এই তিন পক্ষ হচ্ছে পরিকল্পনাকারী, হত্যাকারী এবং বেনিফিশিয়ারি। এদের পারস্পরিক যোগসাজশে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারী, হত্যাকারী এবং বেনিফিশিয়ারিরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তারা মানুষ বঙ্গবন্ধুকে খুন করতে পারলেও বাঙালি জাতির চেতনা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে দিতে পারেনি। পারেনি বাঙালি জাতির সংগ্রাম ও সাফল্যের ইতিহাসকে ম্লান করতে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধু ধনসম্পত্তির মালিক হতে চাননি। রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি জাতি যেন বিশ্বে মাথা তুলে মর্যাদার সঙ্গে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীরের জাতি হিসাবে টিকে থাকে। আজকের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে এখন বাংলাদেশ একটি মর্যাদার নাম। এই দেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র। যতই দিন যাচ্ছে, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ততই গতি বাড়ছে। গোটা বিশ্বের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু এখন প্রাতঃস্মরণীয় নাম। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের মানচিত্রে একদিকে যেমন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন, তেমনই মানবজাতির ইতিহাসে স্বাধীন বাঙালি জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। যে মর্যাদার জন্য বাঙালি হাজার বছর ধরে সংগ্রাম করেও সফল হয়নি। তাই ইতিহাস বলে, 'মুজিব যখন ধরলো হাল পালটে গেল সর্বকাল'। এ কারণেই তাঁকে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা। এটা আওয়ামী লীগের স্লোগান নয়, অথবা নয় শেখানো কোনো গল্প–এটাই ইতিহাস। বুদ্ধি করে কেউ ইতিহাস বানাতে পারে না, মানুষের কর্মে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। কেউ মানুক আর না-ই মানুক, সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশই এখন বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক। যতই দিন যাবে, বিশ্বের সব প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ঠিকানা হবে বাংলাদেশ। কারণ, ছোটো হলেও বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষের একটিই ভাষা, একটিই দেশ। সুতরাং কোনো কালে, কোনো কারণেই ভাষাগত দিক থেকে রূপান্তরিত হওয়ার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। তাই আগামী দিনে বাংলাদেশই সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করবে। এই জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এ কারণেই বিশ্বের ১৯৫টি দেশে পালন করা হয় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। ঘাতকচক্র এখন অনেকটাই দুর্বল। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে সংগঠিত হতে চাইলেও আমজনতার ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলার বা করার সাহস পাচ্ছে না। আগে আমজনতার এই ভয়টা ছিল না। মানুষকে মিথ্যা কথা, বানানো গল্প দিয়ে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে নিজেরা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা করেছিল। যারা একসময় প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করত, তারা এখন বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতে ভয় পায়। কারণ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির চেতনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এখন আলোকবর্তিকা, চেতনা ও শক্তি। এই শক্তিতেই ২০০৮ থেকে ২০২০ সাল– এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ আজ কোথায় চলে গেছে, দেশের বাইরে না গেলে কারও পক্ষেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিশ্বের এমন কোনো দেশ বা জাতি নেই যারা আজ বাংলাদেশকে জানে না, চেনে না। ১৯৯৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। এই সময়ে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বে নজিরবিহীন।

বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উপমহাদেশ তথা বিশ্বের উন্নত অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার আগে যে দেশের মানুষ একবেলা খাবারের জন্য অমানুষিক শ্রম বিক্রি করত, সেই দেশের মানুষ আজ স্বল্প বা সামান্য মূল্যে খাদ্য পায়। ১৭ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা একটি বিস্ময়কর বিষয়। শুধু অর্জনেই নয়, বণ্টনেও বাংলাদেশ একটি মাইলফলক। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য ছাড়াও মৎস্য ও পশুসম্পদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। বর্তমানে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার মহাযজ্ঞের কাজ চলছে। এক্ষেত্রে দেড় লাখ কোটি টাকা বিদেশি বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে। এই ১০০টি অঞ্চলের মধ্যে ৮৮টির স্থান চূড়ান্ত করে ১ লাখ একরের বেশি পরিমাণ জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। জমি নিয়েছে চীন, ভারত, জাপান, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের বড়ো বড়ো বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। পাশাপাশি দেশের বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোও এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে রয়েছে।

> রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি জাতি যেন বিশ্বে মাথা তুলে মর্যাদার সঙ্গে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীরের জাতি হিসাবে টিকে থাকে

বিদ্যুতের জাদুর ছোঁয়ায় চাঙা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। বর্তমানে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ এখন ফেরি করে বিক্রি হয়। দেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের দিক থেকেও বাংলাদেশ এশিয়ায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন গোটা বিশ্বের ঈর্ষণীয় অবস্থানে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোল মডেল।

বর্তমান বিশ্বে কোভিড-১৯-এর ধাক্কা সামলাতে উন্নত দেশগুলোও যেখানে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে নিজেদের কিছু না থাকার পরও দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশ করোনা মোকাবিলা করে যাচ্ছে। দেশে এই মহাদুর্যোগের সময়ও কোনো মানুষ না খেয়ে মারা যায়নি। জীবনযাত্রায় বিধিনিষেধ থাকলেও মানুষ সবকিছু মানিয়ে নিয়ে চলছে। এসবই সম্ভব হচ্ছে সঠিক নেতৃত্ব ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই এই পরিকল্পনার উৎস। তাই ১৫ আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে বাঙালি জাতি ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। জাতির এই অপ্রতিরোধ্য গতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা তুলে দাঁড়াবেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, বিএফইউজে সভাপতি

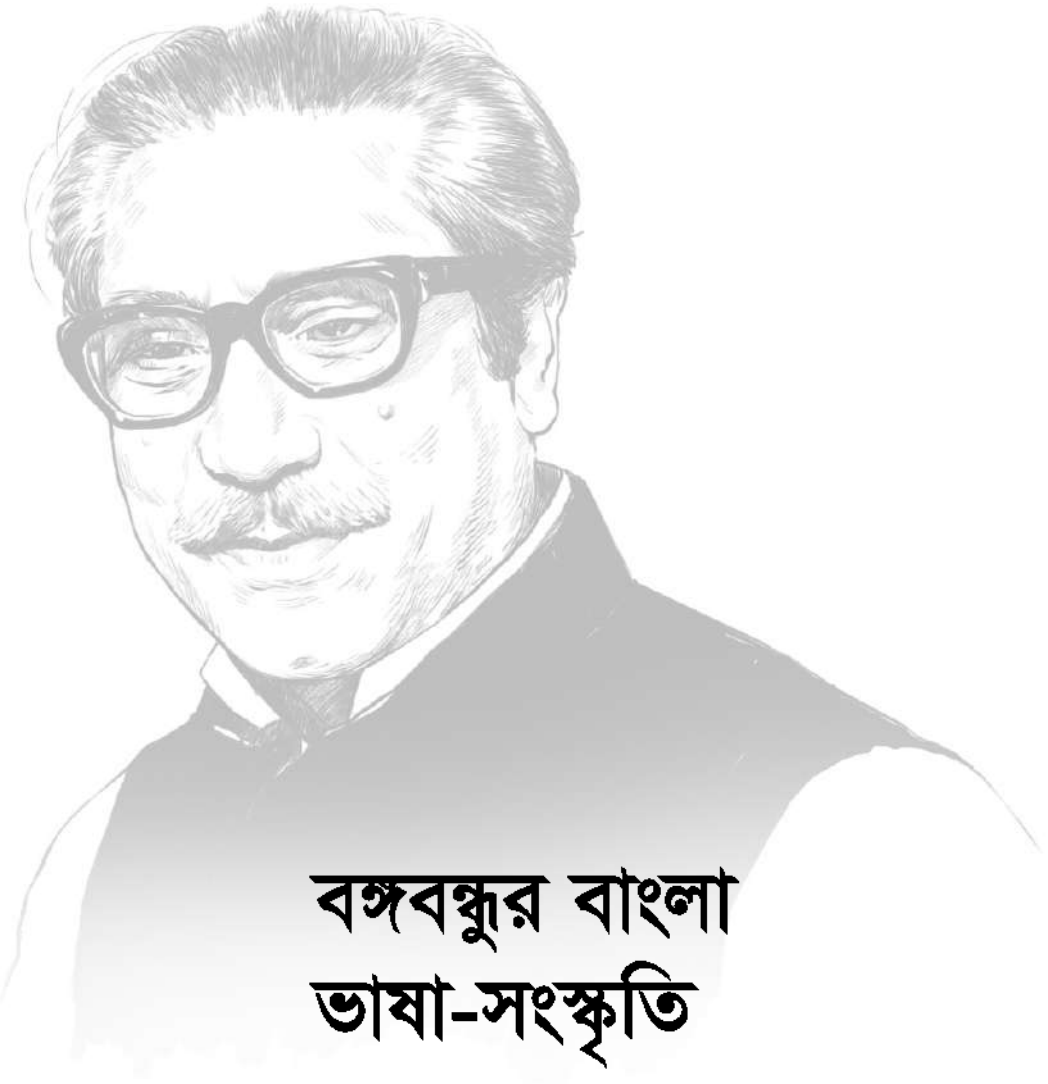

বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি

জাফর ওয়াজেদ

একটি পশ্চাৎপদ জাতির জীবনে সূর্যের মতো দীপ্ত হয়ে তিনি জেগে আছেন, এখনো এই বাংলায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান–বাঙালি জাতির পিতা। জন্মেছিলেন এই বাংলার নিভৃত কোণে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালির জীবনে ইতিহাস সৃষ্টিকারী মাস হিসাবে মার্চ অঙ্গীভূত। বসন্তের উতল হাওয়ায় চৈত্রের শুরুতেই জন্মেছিলেন টুঙ্গিপাড়ায়, বাঙালির তীর্থস্থানে। তারপর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন। পথ যতই হোক চড়াই-উতরাই, বন্ধুর–দুপায়ে মাড়িয়ে গেছেন। সব বাধা, প্রতিবন্ধকতার সামনে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু কোথাও টলেননি। আপসহীন ছিলেন আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রশ্নে। পূর্বসূরি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সুভাষ বসু, নজরুল, দেশবন্ধু, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলার পথ ও পন্থাকে আত্মস্থ করে নিজস্ব নতুনপথ নির্মাণ করে এগিয়ে গেছেন। পথে পথে রেখে গেছেন অগ্রযাত্রার স্বাক্ষর। বিজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ব্রিটিশ

ইতিহাসবিদ কার্ল ড্রেজার বাহাত্তরে বলেছিলেন, 'প্রায় বারো শ বছর পর বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম হয়েছে এবং হাজার বছর পরে বাংলাদেশ এমন নেতা পেয়েছে, যিনি রঙে-বর্ণে, ভাষায় এবং জাতি বিচারে প্রকৃতই একজন খাঁটি বাঙালি। বাংলাদেশের মাটি ও ইতিহাস থেকে তাঁর সৃষ্টি এবং তিনি জাতির স্রষ্টা।' খ্যাতনামা ব্রিটিশ সাংবাদিক সিরিল ডান উনিশ শ বাহাত্তর সালে লিখেছেন, 'তিনি সুদর্শন, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অনলবর্ষী বক্তা এবং শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতো ক্ষমতা রাখেন।' ঘুমন্ত জাতিকে তিনি করেছিলেন 'ইতিহাস রচনাকারী দুর্জয় বীর।' একক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠা জাতি প্রতিরোধও গড়ে ছিল। দেশের মানুষ একটি দণ্ডে একাত্ম হয়েছিল, তারই বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে। দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম ও যুদ্ধ শেষে একটি নতুন রাষ্ট্রকে বিশ্ব মানচিত্রে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। 'বাঙালি' নামক একটি জাতিসত্তার নিজস্ব স্বাধীন ভূখণ্ড তৈরি করেন। সেই ভূখণ্ড ও তার অধিবাসী নিয়েই তাঁর জীবন-যৌবন, ধ্যানজ্ঞান, সাধনা ছিল। বলেছিলেনও তাই, 'নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা, বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাবে এই আমার জীবনের সাধনা। এই আমার জীবনের কাম্য। আমি যেন এই চেষ্টা করেই মরতে পারি।' চেষ্টা তিনি করেছিলেন আপ্রাণ। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। বারে বারে তিনি ফিরে আসেন এই বাংলায়–কখনো কবিতায়, কখনো গানে-গল্পে, ছড়া, উপন্যাস, প্রবন্ধেই শুধু নয়, বাঙালির শিক্ষাদীক্ষাসহ প্রাত্যহিক জীবনে। বাংলার মাটি, বাংলার জলকে পুষ্ট করেছেন তিনি। আলোর সাধনাই করেছেন। নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। বাঙালির যে লালিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তাকে লালন করেছেন নিজের জীবনে যেমন, তেমনই প্রসারিত করেছেন মানুষজনের কাছে। বাঙালির ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত লড়াই-সংগ্রাম করেছেন।

বাংলার মাটি, বাংলার জলকে পুষ্ট করেছেন তিনি। আলোর সাধনাই করেছেন। নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। বাঙালির যে লালিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তাকে লালন করেছেন নিজের জীবনে যেমন, তেমনই প্রসারিত করেছেন মানুষজনের কাছে

বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছেন ছাত্রজীবনেই। আর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে এসে সর্বস্তরে বাংলা প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রশ্নে ছিলেন অটল। এই প্রশ্নে কোনো ছাড় বা আপস করেননি। বাঙালির জীবনচর্চা, তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে পবিত্র জ্ঞান করতেন। গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় সংস্কৃতির বিকাশে বাঙালির লালিত চিরায়ত ধারাকে বিনষ্ট হতে দিতে চাননি। বাঙালিয়ানার সঙ্গে সাযুজ্য যে কোনো জিনিসকে গ্রহণ করতে চাইলেও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সত্তাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। একটি জাতি–আগেই যার ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে–সেই ভাষা ও সংস্কৃতি যখন আক্রান্ত, বিভ্রান্ত, লাঞ্ছিত, তখন তার বিরুদ্ধে অমোঘ ব্যবস্থা গ্রহণই তো স্বাভাবিক। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যতবারই আঘাত এসেছে, ততবারই প্রতিরোধ হয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধু, সেসব প্রতিরোধে নেতৃত্বও দেন।

'আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার আবহাওয়া–তাই নিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ।' বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বাপর সময়ে বহুবার তিনি উচ্চারণ করেছেন এই অমোঘ মন্ত্র। স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন পলিমাটিঘেরা ৫৪ হাজার বর্গমাইলের বদ্বীপের মানুষজনকে, 'জাগো বাঙালি জাগো।' জেগেছিল বৈকি। হাজার বছরের ঘুমন্ত জাতি তার লালিত স্বপ্নের আরাধ্য পুরুষকে পেয়েছিল তার আত্মার কাছাকাছি। যেখানে অহরহ স্পন্দিত হয়েছে বাংলার মন্ত্র। তাই অনায়াসে পুরো জাতির কণ্ঠে তুলে দিতে পেরেছিলেন সেই, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। জীবন সাধনাই ছিল যার বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে–আর এজন্য জেল, জুলুম, হুলিয়া, ফাঁসির কাষ্ঠ পেরিয়ে প্রাণও দিলেন। সপরিবারেই। বাঙালি জাতির একমাত্র ট্র্যাজেডির মহানায়কও তিনি। বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। যিশুখ্রিষ্টের মতো। মহাত্মাগান্ধীর মতো। ঘাতক হরণ করতে পারেনি তাঁর আত্মমর্যাদা। হরণ করতে পারেনি তাঁর বাঙালি সত্তার পূর্ণতা। যিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করেছেন। বলতে পেরেছেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে 'আমি তোমাদেরই লোক।' একটি জাতির মনে যিনি অনেক সূর্যের আশা নিয়ে প্রোজ্জ্বলিত, জাতিকে করেছেন আত্মসচেতন, জাতীয়তাকে দিয়েছেন ভাষা। দিয়েছেন স্লোগান: 'জয় বাংলা'। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মতো বাঙালির জয় চেয়েছেন। আর এই চাওয়াতেই থেমে থাকেননি, ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়। যে জাতি একটি ধর্মান্ধ, সেনাশাসিত রাষ্ট্রে হারিয়ে ফেলেছিল নিজের আত্মা, স্বতন্ত্র সত্তাকে, নিজদেশে ছিল পরবাসী হয়ে, সেই জাতিকে ডাক দিলেন 'জয় বাংলা' বলে। ভূকম্পনের মতো সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠেই যেন রণিত হয়ে ওঠেছিল সেদিন গুলি-বারুদের মুখেও 'জয় বাংলা' ধ্বনি। বাঙালি জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক হয়ে জাতিকে উপহার দিলেন 'আমার সোনার বাংলা' বাঙালির জাতীয় সংগীত। একটি জাতির আত্মশক্তির প্রতীক হয়ে তিনি বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরেছিলেন ভাষাভিত্তিক, জাতীয়তাবোধক রাষ্ট্র। যার ভাষায় তিনি জাতিসংঘে ভাষণও দিয়েছেন।

তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। কারও কাছে ছিলেন শেখ সাহেব, কারও কাছে মুজিব ভাই, কারও কাছে শেখের ব্যাটা। অর্থাৎ বাঙালি তার প্রাণের সম্পর্কে গ্রন্থিত করেছিল তাঁকে সম্বোধনের মাধ্যমে। নানা শ্রেণি, বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিত্রাতা। নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ থেকে শুরু করে পাদপ্রদীপের আলোয় ভাসিত মানুষও তাঁকে কেন্দ্র করেই স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীনতার, মুক্তির। স্বাধীনতাও পেয়েছে। কিন্তু মুক্তির পথ পাড়ি দেওয়ার আগেই বাঙালির জাগরণ, বাঙালির কণ্ঠ, বিশ্বাস, আশা-ভরসা, আস্থার একমাত্র মানবকে নির্মম নৃশংসতায় ঘাতক চক্র বিলীন করে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তো হারিয়ে যাওয়ার, মিলিয়ে যাওয়ার, লুপ্ত হওয়ার নন। তাই যতই পথ পাড়ি দেয় বিমূঢ় জাতি, ততই তিনি উদ্ভাসিত হন। যিশুর মতো

শত্রুকেও বুকে ঠাঁই দিয়েছিলেন, মার্জনা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, তার জাতিসত্তার মানুষ, ভুল শুধরে নেবে। কিন্তু খুনিচক্র স্তম্ভিত করে দেয় একটি জাতিকে। সেই সঙ্গে তার ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। এর রেশ জাতিকে এখনো বহন করতে হয়। অবশ্য ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর ভরসা ছিল তাঁর জনগণ। যে দেশবাসীকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করেছেন স্বাধিকারের পথে, স্বায়ত্তশাসনের পথে। যে জনগণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন সর্বাত্মক ত্যাগের জন্য। তাই দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৯ জানুয়ারির ভাষ্যে: 'তবে ভরসা হচ্ছে, দেশবাসী আজ সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত। ষড়যন্ত্র জালকে ছিন্নভিন্ন করে কায়েমি স্বার্থবাদকে খতম করার ক্ষমতা দেশবাসী রাখে।' তিনি পাকিস্তানি নেতাকে বলে দিয়েছিলেন একাত্তরের গোড়াতেই, 'আমি ঘোরপ্যাঁচে বিশ্বাস করি না। আমি সোজা পথের পথিক এবং সমস্যাবলির আমি সরাসরি সমাধান চাই।' চেয়েছিলেনও তাই। সেই সুযোগও তিনি দিয়েছিলেন। হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন শাসকগোষ্ঠীকে, 'আগুন নিয়ে আর খেলবেন না।' সেই সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তাকে স্বাধীনতার জন্য, কঠিন সংগ্রামের জন্য তৈরি হতে বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জে মিশনারি স্কুলে পড়েছেন। সেই সুবাদে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাও আয়ত্তে ছিল। পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্যকালে আরবি শিখেছেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছেন অর্থ জেনেই। ইংরেজি জানা ছিল বলেই শুধু নয়, মেধাবী হওয়ার কারণেও কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি এবং বেকার হোস্টেলে সিট পাওয়া সহজসাধ্য হয়েছিল। কলকাতা এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানে উর্দুভাষীদের সঙ্গে রাজনীতিচর্চার কারণে উর্দু ভাষাও জানা ছিল ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় তিনি করাচি, লাহোরে বক্তৃতা দিলেও পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে কখনো উর্দুতে বাতচিত করেননি। উপমহাদেশীয় বহুলপ্রচলিত ভাষা হিসাবে হিন্দিও বঙ্গবন্ধুর অজানা ছিল না। নানা ভাষা বঙ্গবন্ধুকে উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে নিজস্ব ভাষার স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যকে বহাল রাখার সংগ্রামে বলীয়ান হতে। বঙ্গবন্ধুর পাঠের তালিকায় এসব ভাষার গ্রন্থ দেখা যায়। জেলখানায় যেমন পাঠাগারে কাটাতেন, বাড়ির পাঠাগারেও তেমনই। রবীন্দ্র-নজরুল রচনাবলি বহুবারই পাঠ করতে হয়েছে দীর্ঘ সময় জেলে কাটানোর কারণে। কলকাতায় ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পরও স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন যথাসময়ে। বেকার হোস্টেলে তার প্রতিবেশী ছিলেন কবি গোলাম কুদ্দুস। সেই সুবাদে সেসময়ে অনেক লেখক, সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। স্বাধীন দেশে তিনি তাদের অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সম্মানও প্রদর্শন করেছেন।

১৯৪৭ সালে দেশ যখন ভাগ হলো, তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব উপলব্ধি করলেন, এক উপনিবেশ থেকে বাঙালি আরেক উপনিবেশের অধীন হলো। কলকাতা ছেড়ে আসার আগে ঘরোয়া বৈঠকে সহকর্মী ছাত্রনেতা কয়েকজনকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, 'আমরা শেষ হয়ে গেছি, নতুন করে সংগ্রাম শুরু করতে হবে।' ঢাকায় এসে রাজনৈতিক পরিবেশ দেখে বুঝতে পারলেন যে, বাঙালি জাতি শেষ হয়ে গেছে, 'সেই দিনই শপথ নিলাম, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে।' আর এর কিছুদিন পরই দেখলেন বাঙালির ভাষা ও কৃষ্টির ওপর স্বয়ং পাকিস্তানের নেতা জিন্নাহসহ শাসকগোষ্ঠীর আঘাত। থেমে থাকেননি। প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে গঠন করেন ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। এই সংগঠনের নেতৃত্বেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে শুরু করেন আন্দোলন। বাঙালির জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার প্রশ্নটি ছিল তীব্র। 'রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আন্দোলন করতাম'—কী কঠিন অবস্থা ছিল। জনগণের ঘোর কাটানো ছিল প্রধান দায়িত্ব। ছাত্র ও সেসময় শিক্ষিত সমাজ আন্দোলনে শামিল হলেও জনগণ ছিল নির্জীব। 'সেদিন অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে বাংলাকে এবং বাঙালিকে শেষ করতে ষড়যন্ত্র চলছিল।' ঠিক সেসময়ই ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদেরসহ জেলে আটক থাকা অবস্থায় সংকল্পে আরও দৃঢ় হন যে, বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, নতুবা ব্রিটিশদের নির্মম শোষণ শেষে পাকিস্তানি প্রভুদের শোষণ ত্রাসনে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াবে। বাঙালি জাতি বলে কিছুই থাকবে না। যে জাতি কিছুদিন আগেই 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে আন্দোলন করেছে, তাদেরকে জাগিয়ে তুলতে হবে বাংলা ও বাঙালিকে রক্ষা করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর জানা ছিল সংস্কৃতির বাহন হিসাবে ভাষা হচ্ছে জাতির সামগ্রিক ঐতিহ্যের ধারক। ভাষা নিছক ভাবপ্রকাশ মাত্রে সীমাবদ্ধ নয়, একটি জাতির সার্বিক বিকাশ-বিনিময়ের মাধ্যম। জানতেন তিনি, মাতৃভাষা দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা না পেলে সেই ভাষাভাষী মানুষের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয়, তারা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় তার ভাষায়। রাষ্ট্র-জাতির পরিচয়ের চেয়ে অনেক গভীরে নিহিত সেই পরিচয়ের শিকড়। দেখলেন, বাংলাকে উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করে পশ্চিম ভূভাগকে সমৃদ্ধ করে নিচ্ছে।

বাঙালির ভাষা হিসাবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার সব আয়োজন ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব একাট্টা হয়ে জীবনমরণ লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তিনি জাতিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেন প্রিয় বাংলা ভাষা ও বাঙালি ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের দিকে। বাঙালি তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো সেসময় থেকে চিনে নিতে শুরু করে। পাকিস্তানি আর বাঙালিতে দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। কায়মনে বাঙালি হওয়ার জন্য শেখ মুজিব তাঁর জীবন সাধনা ও সংগ্রাম শুরু করেন সেই ১৯৪৮ সালেই। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় যখন একদল বাঙালি 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি করেন, তখন শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতারা স্লোগান দিলেন, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। পাকিস্তানিরা শুরু থেকেই 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে নানাভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ামক শক্তি হিসাবে সামনে তুলে ধরে ধর্মকে। বঙ্গবন্ধু দেখলেন, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলা ও উর্দুর মিশ্রণে নতুন পাকিস্তানি ভাষা উদ্ভব, কিংবা আরবি হরফে বাংলা লেখার জন্য নানা অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলা বর্ণমালা, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতির সংস্কার, বাংলা ভাষা সরলীকরণ, রোমান ও আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তন প্রভৃতি উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে এবং সেই সূত্রে বাংলা সাহিত্যকে দুর্বল ও বিকৃত, বাঙালি সংস্কৃতিকে পঙ্গু-খণ্ডিত করে এবং ওই পথ ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করার সার্বিক অপপ্রয়াস চালায় শাসকরা। শেখ মুজিব ক্রমশ প্রতিরোধী হয়ে ওঠেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংহত করতে প্রাগ্রসর ভূমিকা রাখে। তারপরও বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদী শাসক শোষক চক্রের ষড়যন্ত্র বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে তারা বাঙালি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহায়তা পায়। শেখ মুজিব বুঝেছিলেন, গণতান্ত্রিক, শোষণহীন, মানবিক সমাজ বিনির্মাণে পাকিস্তান এক অনুর্বর ক্ষেত্র।

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হলেও এই ভাষার প্রতি অবমাননা থেমে থাকেনি। পাকিস্তানি গণপরিষদেও বাংলায় ভাষণ প্রদানে নিরুৎসাহিত করা হতো। বাধ্য হয়ে ইংরেজিতে ভাষণ দিতে হতো। এমনকি সংসদের দিনের কার্যসূচিতে বাংলা ভাষা নয়, থাকত উর্দু ও ইংরেজি। গণপরিষদ সদস্য শেখ মুজিব সেই পঞ্চাশ দশকেই সংসদের ভেতর প্রতিবাদী হয়ে

ওঠেন। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৯ নভেম্বর করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে ফ্লোর নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্পিকারের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমাকে বাংলায় কথা বলতে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, এ ভাষা আপনার বোধগম্য হবে না, তবুও আমাকে বাংলাতেই বলতে হবে।' বঙ্গবন্ধু সেদিন শুধু নয়, তার আগে পরেও বাংলায় বক্তব্য রেখেছেন। পাকিস্তান সংসদের সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা। অধিবেশনকালে সদস্যদের কাছে দিনের যে কার্যসূচি বিতরণ করা হতো তাতে বাংলা ভাষা না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৬ সালের ৭ জানুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে স্পিকারকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'আমি জানি না, বিষয়টি আপনি অবগত আছেন কি না? কিংবা এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে কি না? কিন্তু জানতে চাই, সংসদের অফিস থেকে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে এবং কেনইবা বাংলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?' এসব প্রশ্ন রেখে বঙ্গবন্ধু কার্যপ্রণালি বিধির সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'যেহেতু তিনটি ভাষাই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত, সেহেতু তিনটি ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। যদি দিনের আলোচ্য কর্মসূচি ইংরেজি ও উর্দুতে করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই বাংলাতেও করতে হবে। কেননা দিনের কার্যসূচি কার্যবিবরণীরই অংশবিশেষ।' এভাবে তিনি সংসদে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করায় ছিলেন সক্রিয়। ১৯৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব আবার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সংসদে। খসড়া শাসনতন্ত্রে ভাষার মারপ্যাঁচে বাংলা ভাষাকে কোণঠাসা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যাতে বলা হয়, 'একটি জাতীয় ভাষা (ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ) উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব হবে ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের।' আবার আরেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সরকারি ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।' বঙ্গবন্ধু এই 'জাতীয় ভাষা' ও 'সরকারি বা দাপ্তরিক ভাষা' যে পৃথক জিনিস, তা 'চোখে আঙুল দিয়ে' দেখিয়ে দেন। তিনি স্পষ্ট করেন দাপ্তরিক ভাষার অর্থ রাষ্ট্রভাষা নয়। দাপ্তরিক ভাষা দপ্তরের ভাষা। তিনি 'একটি জাতীয় ভাষা' শব্দনিচয়ের প্রতি বিশেষভাবে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'এটা কিন্তু ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে।' ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী ঘোষণা করলেন যে, সরকারি বা দাপ্তরিক ভাষা (অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ) অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা (স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ)। শেখ মুজিব এই বিষয়টি উল্লেখ করে বললেন, 'ব্রিটিশ রাজত্বকালে ইংরেজি সরকারি ভাষাও ছিল এবং আমরা বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ব্যবহার করতাম। পূর্ব বাংলায় আমরা সরকারি বলতে রাষ্ট্রভাষাকে বোঝাই না।' এই 'দাপ্তরিক ভাষা' শব্দযুগল ব্যবহারের পেছনে শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের যে দুরভিসন্ধি রয়েছে, তা সংসদেই উপস্থাপন করে বলেন, 'যদি দুরভিসন্ধি নাও থাকে এবং তা যদি ধরেও নেওয়া হয়, তাহলেও দেখা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে, উর্দু ও বাংলা হবে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা এবং খসড়া শাসনতন্ত্রে ওই মর্মে বিধানও রাখা হয়েছিল। তিনি এই ধারার ওপর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। সংশোধনীতে শেখ মুজিব উল্লেখ করেন, 'দুটি রাষ্ট্রভাষা যথা, বাংলা ও উর্দু উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব হবে ফেডারেল ও প্রাদেশিক সরকারের।' শেখ মুজিব এ দুই রাষ্ট্রভাষার উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি তুলে বলেন, 'পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা এবং আপনি যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে আমি এর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতেও প্রস্তুত।' সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, ভাওয়ালপুর ইত্যাদি নিয়ে তৎকালীন গঠিত এলাকায় উর্দু ছিল শিক্ষার মাধ্যম। পূর্ববাংলায় একমাত্র বাংলা ভাষাতেই জনগণ কথা বলে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু, সিন্ধু, পশতু ও পাঞ্জাবি ভাষাভাষী জনগণ। কিন্তু সেখানে, যেখানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ রয়েছে, তারা সবাই বাংলাভাষী, 'তাই এসব কারণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝতে পারি না বিতর্কটা কেন? তারা এর অবসান ঘটান না কেন? তারা বিষয়টিকে নিয়ে এত প্যাঁচানোর চেষ্টা করছেন কেন? তাদের কাজই হলো সবকিছুকে প্যাঁচিয়ে ধোঁয়াটে করে তোলা এবং জনগণকে ধোঁকা দেওয়া। সব ব্যাপারেই তাদের রয়েছে দুরভিসন্ধি এবং সবকিছুতেই তারা প্যাঁচ মারার চেষ্টা করেন, যা তারা বিগত এই আট বছর ধরে করে আসছেন এবং আমার গরিব দেশকে ধোঁকা দিয়ে আসছেন।' বঙ্গবন্ধু তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবকে জনগণের দাবি হিসাবে উল্লেখ করে এটা গ্রহণ করতে বাধ্য বলে মন্তব্য করেন। 'এখন তারা তাদের পিঠ বাঁচানোর জন্য বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। তারা এটা করতে বাধ্য, কারণ এর পেছনে রয়েছে জনগণের শক্তি।' সেসময়ের পাসপোর্টে বাংলা বাদ দিয়ে কেবল ইংরেজি ও উর্দু ব্যবহারের প্রতিবাদ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যবহারের দাবি শেখ মুজিব করেছিলেন পাকিস্তানের সংসদে সেই পঞ্চাশের দশকে। তখন এই বাংলায় জন্মগ্রহণকারী অন্য নেতারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে আপস, বাঙালির অধিকার বিসর্জন দেওয়ার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব নেতা আরবি হরফে বাংলা লেখায়। কখনো বা উর্দুকে বাঙালির ভাষা করার জন্য নানা উদ্যোগ সংসদের ভেতরে-বাইরে নেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারি সংসদে শেখ মুজিব প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'ইসলামের ভাষার কথা বলা হয়। ইসলামের ভাষা কোনটি? আরবি, ফারসি, উর্দু নাকি বাংলা? মুসলমানের ভাষা কোনটি, তা ফয়সালা করবে কে?' তিনি বাংলার পক্ষে এভাবে অটল অবস্থান নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদে বাঙালির দাবি

> পাকিস্তান সংসদের সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা। অধিবেশনকালে সদস্যদের কাছে দিনের যে কার্যসূচি বিতরণ করা হতো তাতে বাংলা ভাষা না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান

আদায়ের কাজ শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি দার্শনিক নই। কিংবা নই ভালো আইনজীবী। তদুপরি আমি যা বলি, তা সোজাসুজি বলি।'

বাংলা ও বাঙালির জীবনঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেই তরুণ বয়সেই স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চেতা অবস্থান নিয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে সমগ্র জাতি তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ঘোষণা হিসাবে যে ২১ দফা পেশ করা হয়, তাতে বাংলা ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। ১৬নং দফায় উল্লেখ করা হয়, ... বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে। ১৭ দফায় বলা হয়, বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহিদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ১৮ দফায় ছিল, একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ঘোষণা করে একে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে। ওই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যায়। তবে পাকিস্তানি শাসক চক্রান্ত করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। বঙ্গবন্ধু ওই মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ভাষা গবেষণাগার করার স্বপ্ন ছিল তাঁর। ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল বাংলা একাডেমি। আজও বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারের চিহ্ন হয়ে আছে। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলির আদেশ দিয়েছিলেন। তাই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় এসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। এই বাংলা একাডেমিকে নিয়ে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পর্বে স্বৈরাচারী সরকারগুলো নানা ধরনের খেলা খেলেছে। বঙ্গবন্ধুর সবই জানা।

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে বাংলার গণমানুষের বিপুল ভোটে নির্বাচিত মহানায়ক বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বাংলা একাডেমির মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মাত্র তিন লাখ টাকা সরকার বার্ষিক বরাদ্দ করেছে। এর জন্য কাকে দোষ দেব? যারা এসব করেছে, সে আমলারা তো এদেশেরই ছেলে। বাংলা একাডেমির ভেতরের সব কথাই আমি জানি। লোক বদল করে নতুন নতুন লোক এনে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চালানো হয়েছে তাও জানি।' বঙ্গবন্ধু সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সব সরকারি অফিস-আদালতে ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করব না। কারণ, তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।' কথা তিনি রেখেছিলেন। স্বাধীনতার পর পরই অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু হয়। ভাষার উন্নয়ন, বিকাশ, পরিভাষা তৈরির জন্য ব্যাপক উদ্যোগও নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ভাষার বিকাশে শিল্পী-সাহিত্যিকদের করণীয় তুলে ধরেছিলেন। 'মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজে তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতিরোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসাবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যই সাহিত্য। এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনির মাধ্যমে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।' এই যে বুদ্ধিজীবীদের অতীত ভূমিকা ভুলে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন, সে বিষয়টি তিনি এর আগেই খোলাসা করেছেন। যেখানে ভাষা ও স্বাধিকার প্রশ্নে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আঁতাত করাসহ আপসকামিতার যে নিদর্শন সেসময় ঘটছিল, বঙ্গবন্ধু তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'বাঙালির স্বজাত্যবোধকে টুঁটি চেপে হত্যার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বারবার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করেছে এদেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কজন আছেন? বিবেকের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনি দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এদেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতাসংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্যসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তার কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই। একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ জাতীয়তাবাদ সত্য।' এই যে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী, যারা বাঙালির স্বাধিকার-স্বাধীনতা নয়, ইসলামি পাকিস্তান নামক অলীক ভাবাদর্শ প্রচারে নিবেদিত ছিলেন, তাদের বঙ্গবন্ধুর চেনা ছিল। বঙ্গবন্ধু উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার শহিদ হওয়াসহ এদেশের অসংখ্য মায়ের নাম না জানা সন্তানদের শহিদ হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, 'স্বৈরাচারী চক্র সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে কোনো কোনো প্রফেসরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক তো সেদিন স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ করেন নাই। তখন অধ্যাপকরা একযোগে পদত্যাগ করলে আন্দোলনে এ রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হতো না।' এই অধ্যাপকদের অনেকেই স্বাধীনতার পূর্বাপর বঙ্গবন্ধুবিরোধী ভূমিকায় ছিলেন নিবেদিত।

পাকিস্তান পর্বে এদেশের বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ পেশাজীবীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্ট। প্রায় সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর পরই তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে তার ভাবনাকে তুলে ধরেছিলেন, যা দীর্ঘদিন তার মানসপটে লালিত ছিল। 'শিল্পী-সাহিত্যিক এবং কবিদের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে। তারা তাদের মানুষ, তাদের মাতৃভূমি ও সংস্কৃতির জন্যে শিল্পচর্চা করবেন।' অর্থাৎ বাঙালির শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি গণমানুষের জন্য হোক—এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রবিষয়ক ইত্তেফাক গ্রুপের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পূর্বাণীর' প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু আবেদন জানিয়েছিলেন, জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্য। তিনি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'শিল্পী, কবি এবং সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোনো অন্তরায় আমার দল এবং আমি প্রতিহত করব। আজ আমাদের সংস্কৃতির সামনে কোনো চক্রান্ত নেই। শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্যে সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট করেছিলেন

যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বলেই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি। বঙ্গবন্ধু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'যে সংস্কৃতির সাথে দেশের মাটি ও মনের সম্পর্ক নেই, তা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।' বঙ্গবন্ধু বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অতীতে যেসব চক্রান্ত হয়েছে, সেসব স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসব বন্ধের কথা বলেন। 'বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যেসব বাঙালি সরকারি সমর্থন পেয়েছেন, তাদের দিন আজ শেষ।' বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশন এই ষড়যন্ত্রের দোসর। তারা রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর পুরো জীবন সাধনায় বাঙালির সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন যে কোনো মূল্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই চাইতেন মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বনে গড়ে ওঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি। ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় দেশের সংগীতশিল্পী সমাজ বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা প্রদানকালে 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আপনারা ভালোবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্য গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা জোগাতে হবে, যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্য সাত কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।' বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নীতিনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এ আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছিল, তখন একশ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছর মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশান্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন? কোন ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? কোন বিশেষ মহল তথাকথিত ইসলামের নামে নজরুলের গান ও কবিতার শব্দ বদলেছে? রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়? যে মৌলিক গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরি শাসনের পতন ঘটানোর জন্য বাংলার বীর ছাত্রজনতা শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়েছে, শাসকদেরই গুণকীর্তন করে, প্রবন্ধ লিখে, বেতার কথিকা প্রচার করে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ পয়সা রোজগার করেছেন।' পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের যে অংশটির কলঙ্কিত ভূমিকায় সমালোচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার পর তারাই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষায় কলম ধরেছিলেন। চল্লিশ বছর আগে বঙ্গবন্ধু শিল্পীসমাজের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন বাঙালির স্লোগান, 'জয় বাংলা'। এই স্লোগানের মধ্যেই এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি যে নিহিত, তা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, 'শিল্পীদের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতিই এগিয়ে আসবে।'

বঙ্গবন্ধু ষাটের দশকে বাঙালির মুক্তিসনদ হিসাবে 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এটি ছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাঙালির পাঠ্য রাজনৈতিক দলিল। যে দলিলের ভিত্তিতে বাঙালি সত্তরের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী করেছিল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলকে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার প্রচারণার জন্য ষাটের দশকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ করেছিলেন 'নতুন দিন'। সম্পাদক ছিলেন নজরুলের অনুরাগী এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন সুফী লুতফর রহমান জুলফিকার। পত্রিকাটি অবশ্য দীর্ঘায়ু হয়নি। বঙ্গবন্ধু কঁচিকাচার আসর ও মুকুল ফৌজের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বাঙালি গড়ে তোলার জন্য নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছিলেন। ষাটের দশকে যারা কঁচিকাচার আসর করতেন, তাদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

> বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর পুরো জীবন সাধনায় বাঙালির সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন যে কোনো মূল্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন

দেশের সংস্কৃতিকে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সংস্কৃতিভাবুক শিক্ষিতজনেরই এই কথাটা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা পূর্বাপর সময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ব বঙ্গবাসী হাজার বছরের বেশি এই জনপদে বসবাস করে আসছে পরাধীনতার শৃঙ্খলে দীর্ঘকাল ধরে। সেই ঘুমন্ত জাতির মধ্যে তার জাতিসত্তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ৭ জুন বলেছিলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, 'বাংলার সভ্যতা, বাঙালি জাতি–এ নিয়ে হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাই নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে হতে বাঙালিকে একটি ভাষাভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দিয়েছে। অবশ্য রক্তপাতের বিনিময়ে। বাঙালি যে পাকিস্তানি নয়, বঙ্গবন্ধু বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এমনকি যখন পূর্ববঙ্গ নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়, বঙ্গবন্ধু সোচ্চার কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধু এজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতি একই জীবনের দুরকম উৎসারণ।

স্বাধীন দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আদল কী হবে, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে। ১৪ থেকে ২১

ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী প্রথম জাতীয় বাংলা সাহিত্য সম্মেলন হয় বাংলা একাডেমিতে। মহতী সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু 'সাহিত্য ও শিল্পের উৎস জনগণ' এই সত্যের স্বীকৃতিদান করে সুষ্ঠু জাতি গঠনে এবং জাতির চিন্তাচেতনা ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বলেছিলেন তিনি, 'দীর্ঘকালব্যাপী নানা শোষণ এবং বঞ্চনার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ আমরা দরিদ্র, ক্ষুধার্থ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আজ আমরা অর্থনৈতির মুক্তির সংগ্রামে এবং দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু সাহিত্য, সাংস্কৃতি, ঐতিহ্যের দিক থেকে আমরা দরিদ্র নয়। আমাদের ভাষা দুই হাজারের বছরের গৌরবময় একটি ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ। আমাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আজকে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশ ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করব।'

বঙ্গবন্ধু সেদিন স্পষ্ট করেছিলেন বাঙালির শিল্প-সাহিত্য কী ধরনের হওয়া সংগত বলেছিলেন, 'আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎসুক। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো সাহিত্য বা কোনো মহত সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারা জীবন জনগণকে নিয়েই সংগ্রাম করেছি, এখনো করছি, ভবিষ্যতেও করব। যা কিছু করব, জনগণকে নিয়েই করব। সুধী বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আবেদন, আমাদের সাহিত্য শুধু শহরের পাকা দালানেই যেন আবদ্ধ না থাকে। বাংলাদেশের গ্রাম গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের স্পন্দনও যাতে প্রতিফলিত হয়।'

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির দিগন্তকে এগিয়ে নিতে সোনার মানুষের কথা বলেছেন, 'একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প কৃষি যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্র এই কথা বলি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই, সোনার মানুষ আকাশ থেকেও পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি করতে হবে। নবতম চিন্তাচেতনা মূল্যবোধের মাধ্যমে সেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। মানবতার দক্ষ প্রকৌশলী দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী।' এই সম্মেলনে সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-বক্তৃতায় কাব্যভাষার প্রয়োগ মেলে। উদাহরণ হিসাবে ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা যায়। কিন্তু এটি কেবল ৭ মার্চের ভাষণেই নয়, তাঁর অতীতের অনেক ভাষণে কাব্যভাষা, ছন্দ, মাত্রা, অনুপ্রাসের অনুরণন মেলে। ১৯৭০ সালের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁর কাব্যভাষা। 'ভাইয়েরা আমার, পাকিস্তানের ইতিহাস, দুঃখের ইতিহাস। বাইশ বৎসর হয়ে গেল, পাকিস্তানের সরকার এই দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না। ভাইয়েরা আমার, আজ আপনাদের সামনে বিরাট পরীক্ষা। আপনারা কী করবেন, কী করেছেন, আপনারা 'স্বাধীন দেশের মতো' বাস করতে চান কি চান না? ...ভাইয়েরা আমার, আজ ২২ বৎসর স্বাধীনতা পেয়েছি। কি পেয়েছি আমরা? পেয়েছি হাওয়া, পেয়েছি গুলি, পেয়েছি অত্যাচার, পেয়েছি জুলুম, পেয়েছি হুংকার, পেয়েছি দুর্নীতি, পেয়েছি বুক খা খা করা আর্তনাদ। গরিব যখন কিছু দাবি করে, তাদের ওপর গুলি চালিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিক যখন দাবি করে, তাদের অত্যাচার করা হয়। মজুরি যখন দাবি করে, তাদের ওপর জুলুম করা হয়। ২২ বছরের ইতিহাস, খুনের ইতিহাস। ২২ বছরের ইতিহাস মীর জাফরের ইতিহাস। ২২ বছরের ইতিহাস, খুবই করুণ ইতিহাস। ইতিহাস গৃহহারা সর্বহারার আর্তনাদের ইতিহাস। আমরা সংগ্রাম করেছি। ২২ বছর কেটে গেল আমরা জীবন যৌবন ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পেলাম কী আজ আমরা। আজকে দেশের মধ্যে গ্রামে গ্রামে হাহাকার। সব পুড়ে পুড়ে দাউ দাউ হচ্ছে। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আমার দেশের গরিব ভাইয়েরা উদরে ভাত দেয় না, গায়ে কাপড় দেয় না, ঋণের বোঝা দিন দিন বেড়ে চলছে।' এই যে ভাষণ যাতে বাংলা ও বাংলার মানুষের আর্তনাদ, হাহাকার আর শোষণের কথা বলেছেন, তাতে শব্দচয়ন ও ব্যবহারে পরিমিতিবোধ, প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য মেলে। দুঃখের চালচিত্রের কথা বলেই তিনি থেমে থাকেননি। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের কথাও বলেছেন। যে ভাষায় যে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন, তাতে বঙ্গবন্ধুর ভাষাবোধ পরিলক্ষিত হয়। "আগুন নিয়ে খেলা করো না, তোমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। ষড়যন্ত্র করে, ইলেকশন বানচাল করে, একনায়কত্ব কায়েম করে গদিতে গমন করার চেষ্টা করো না। যেমন আইয়ুব খানকে গদিচ্যুত করা হয়েছে, তোমাদের তা মনে রাখা দরকার। তোমরাও মনে রেখো ষড়যন্ত্র করে দেশ শাসন করা যায় না। গুলি চালিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। দেশ শাসন করতে হয়, ভালোবাসা-মহব্বত দিয়ে। দেশকে ভালোবাসতে হয় দেশের জন্য কাজ করে। যদি বাড়াবাড়ি করো, যদি আবার ষড়যন্ত্র করো, তাহলে লক্ষ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এদেশের মানুষের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই—আমি তোমার ফাঁসিকাষ্ঠে যখন ভয় করি নাই, আমার মা-বোনরা যখন গুলি খেতে শিখেছে, আওয়ামী লীগ কর্মীরা যেহেতু গুলি খাইতে পারে, রাজপথের কর্মীরা যখন গুলি খেতে শিখেছে, শ্রমিকরা যেহেতু গুলি খেতে জানে—প্রস্তুত হয়ে যাও। ষড়যন্ত্র যদি করো, এর মধ্যেই করো। দরকার হয় মৃত্যুবরণ করব।...যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে থাকেন, ভুল করেছেন। ষড়যন্ত্র আর কইরেন না, আর কইরেন না। বাধা দিব। দরকার হয়, প্রতিবন্ধকতা তৈরি করব। দরকার হয় শহিদ হব, কিন্তু পাকিস্তানের গরিব-দুঃখী মানুষকে আর শোষণ করতে দেব না।" এই ভাষণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছোটো ছোটো বাক্য। কিন্তু অর্থের দ্যোতনা অনেক বেশি। হুমকির ভাষা যখন, তখন আঞ্চলিক বা উপভাষাকে সামনে এনেছেন, যা শ্রোতা উদ্দীপ্ত বৈকি—'আর কইরেন না'। এই উচ্চারণ শ্রোতাদের অন্তরে পৌঁছে যায় সহজে।

১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর বেতার-টিভিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ভাষণ দেন, সেখানেও তাঁর ভাষা সৌকর্য উল্লেখ করার মতো। সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে সহজ সংযোগ সাধন করার ভাষাই তিনি ব্যবহার করেছেন ভাষণে। বলেছেন, '২৩টি বছরের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসনে বাংলার মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে নেই বস্ত্র, সংস্থান নেই বাসস্থানের। বাংলার অতীত আজ সুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।...গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে আজও যারা ঘুমিয়ে আছেন, তাদেরকে এবার ডাক দিয়ে কেবল বলে যেতে চাই, জাগো, বাঙালি জাগো। তোমাদের জাগরণেই এদেশের সাত কোটি মানুষের মুক্তি।' এই ভাষণে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য একসূত্রে গ্রথিত। অনুপ্রাস এসেছে। বিপ্লবী চেতনা জাগাতে মানুষের মধ্যে, সহজসরল ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করেছেন বঙ্গবন্ধু। প্রতিটি বাক্য নানা দ্যোতনা বহন করে। শ্রোতা তার বোধ দিয়ে উপলব্ধি করে নিতে পারে। কবিতার অনুরণন এখানে সহজেই মেলে। জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাদের ভেতরে জাগিয়ে তোলার জন্য সংঘবদ্ধ করার কাজটি এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি করেছেন।

আরও একটি ভাষণের দিকে তাকানো যায়। আবেগপূর্ণ মনে হলেও তাতে ছিল একটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর চিন্তাচেতনার প্রতিফলন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায়। দেশে তখন সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু দুর্গত এলাকা ঘুরে এসে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত ভাষণের বাইরে যেসব বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তার গাঁথুনি অত্যন্ত মজবুত। "আজ শপথ নিচ্ছি, বাংলার উপকূল অঞ্চলে এবার যা ঘটেছে, তা আর ঘটতে দেব না। এবারে ঐতিহাসিক বিপর্যয় সারা বিশ্বের কাছে এই মহাসত্যই তুলে ধরেছে যে, সাত কোটি বাঙালি কত অসহায়। শুধু শহরে, বন্দরে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নয়, বাংলার প্রতিটি পল্লিতে, প্রতিটি অলিতে-গলিতে, দ্বীপাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় এই মহাসত্যই আজ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে–আমাদের শাসনভার আমাদের হাতেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের মালিক মোক্তার আমাদেরই হতে হবে।"

স্বাধিকার আদায়ের জন্য ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে যে ভাষণ দেন, তাতে আবেগপূর্ণ ভাষার আড়ালে প্রতিরোধী হওয়ার, কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। ৭ মার্চ ভাষণের পূর্ব পটভূমি এই ভাষণে মেলে। 'প্রয়োজনে বাঙালি আরও রক্ত দেবে, জীবন দেবে; কিন্তু স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস করবে না। বাংলার মানুষ যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে; বরকত, সালাম, রফিক, শফিকরা নিজেদের জীবন দিয়ে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন। বায়ান্ন সালে রক্তদানের পর বাষট্টি, ছেষট্টি, উনসত্তরে–বারবার বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়েছে। কিন্তু আজও সেই স্বাধিকার আদায় হয়নি। আজও আমাদের স্বাধিকারের দাবি বানচাল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য বাংলার ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে হবে। এবার চূড়ান্ত সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে আমরা গাজী হয়ে ফিরে আসতে চাই। চরম ত্যাগের এবং প্রস্তুতির বাণী নিয়ে আপনারা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ুন। বাংলার প্রতিটি ঘরকে স্বাধিকারের এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে দেখিয়ে দিলেন; বাঙালিকে পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারও নেই।' এই দাবিয়ে রাখা বাক্য তো মার্চের ভাষণে 'দাবায়ে রাখবার পারবা না' হয়ে ওঠে এসেছিল। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের শেষে কবিতার অনুরণন মেলে, অথচ এই কবিতার অন্তরজুড়ে রয়েছে একটি দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশিকা ও করণীয়। বললেন তিনি, 'সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানি না আবার কবে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন–বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়। বঞ্চিত না হয়। বাঙালি যেন আর অপমান লাঞ্ছিত না হয়। দেখবেন, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। যতদিন বাংলার আকাশ-বাতাস, মাঠ-নদী থাকবে, ততদিন শহিদরা অমর হয়ে থাকবে। বীর শহিদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফরিয়াদ করে ফিরছে: বাঙালি তোমরা কাপুরুষ হইও না। চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বাধিকার আদায় করো, বাংলার মানুষের প্রতি আমার আহ্বান–প্রস্তুত হোন।' এই ভাষণ বাঙালির জাতিসত্তার জাগরণের দরোজা খুলে দিয়েছিল। মুক্তিকামী মানুষের জন্য প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি ভাষ্য দ্রুত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষা এবং ভাষা ব্যবহারের সৌন্দর্য ছিল গণমানুষের সহজবোধ্যতাকে ধারণ করে। ভাবীকাল যখন এই ভাষণগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যাবেন, দেখা মেলবে, সময় এবং স্থান-কাল-পাত্রকে সামনে রেখে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মেলে ধরেছেন। একটি জাতি, তার ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর কাজটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর নিজস্ব চর্চার মধ্য দিয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

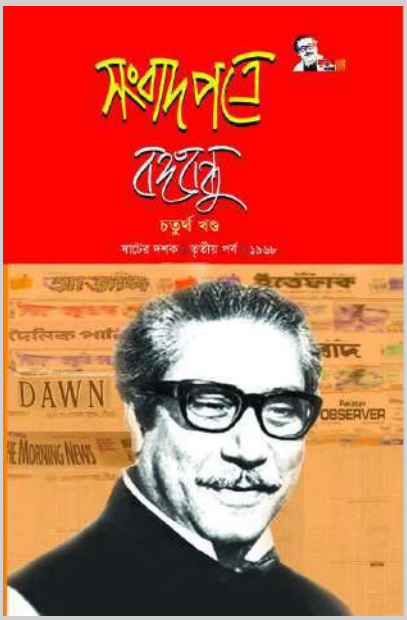

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

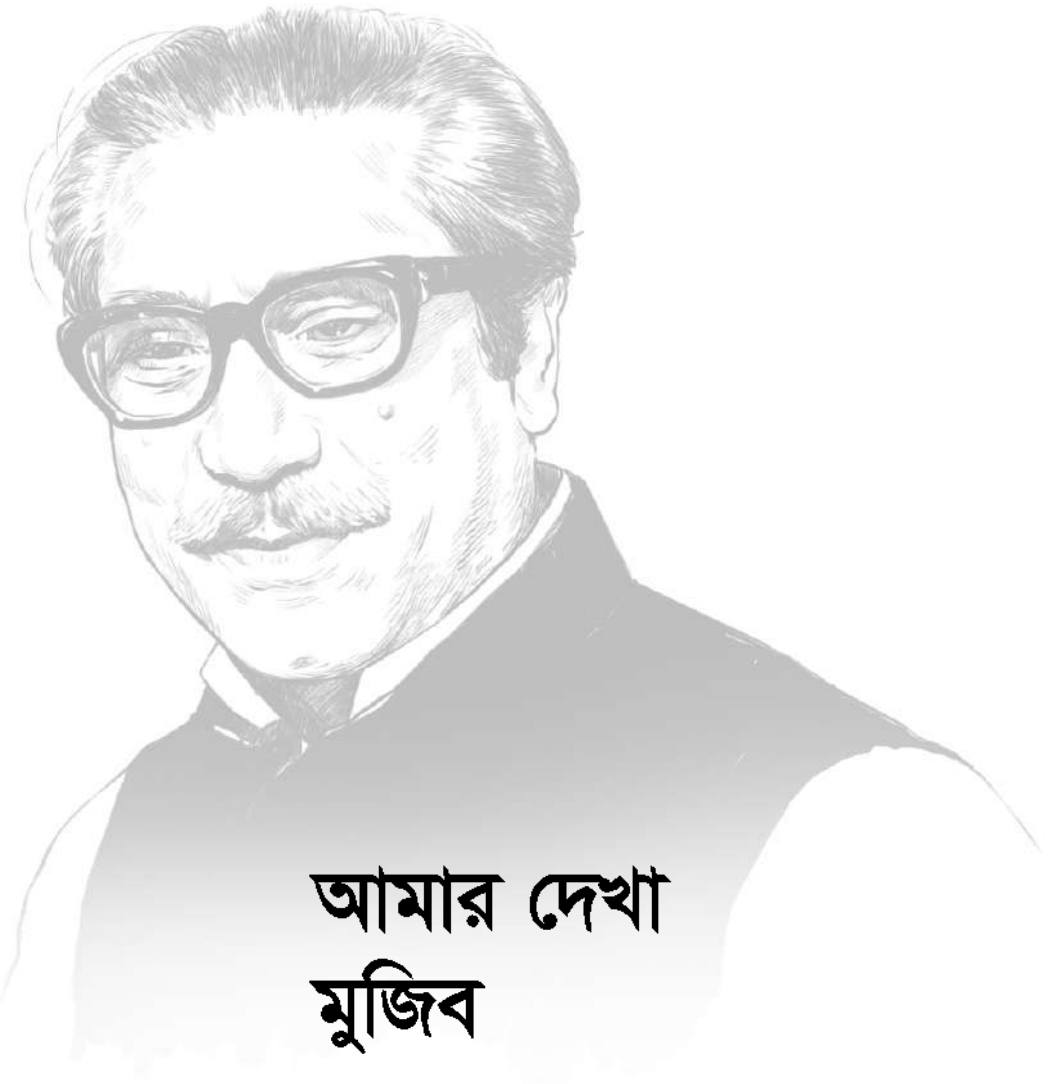

আমার দেখা মুজিব

সুফিয়া কামাল

শেখ মুজিবুর রহমান যখন বঙ্গবন্ধু হয়নি, বলা যেতে পারে তার কিশোর বয়স থেকেই আমি তাকে জানি। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাকে প্রথম দেখি কলকাতায়। তখন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সে। রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর খ্যাতি যখন তুঙ্গে, সেই সময় থেকে ছাত্রকর্মী ছাত্রনেতা হিসেবে মুজিবুর রহমানকে আমি চিনি। নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছে মুজিবুর রহমান। কিন্তু আমার কাছে আমার ছোটো ভাইয়ের মতোই ছিল সে। বরাবর আমাকে 'আপা' বলে সম্বোধন করেছে। কাছে গেছি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। তারপর একই পাড়ায় থাকার কারণে মুজিবের সঙ্গে আমার একটি পারিবারিক সম্বন্ধের মতোন গড়ে উঠেছিল।

মুজিবের কথা বলতে গেলে মুজিবের স্ত্রীর কথাও বলতে হয়। এত ধৈর্যশীল, এত শান্ত, এত নিষ্ঠাবতী মহিলা খুব কমই দেখা যায়। বছরে বারো মাসের মধ্যে বেশির ভাগ সময় মুজিবের কেটেছে জেলে। যখনই শুনেছি মুজিবকে ধরে নিয়ে গেছে–ছুটে গিয়েছি। দেখেছি মুজিবের স্ত্রী

অবিচল মুখে কাপড়, বিছানা-বালিশ গুছিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। বলেছে, আপনার ভাই তো জেলে গেছে। বেচারি খুব ধৈর্যের সঙ্গে সংসারটাকে টেনেছে। বাপকে জেলে নিয়ে গেছে বলে কোনো স্কুল হাসিনাকে ভর্তি করবে না, এমনও দিন গেছে।

নারী শিক্ষা মন্দিরে আমরা তাকে ভর্তি করে নিলাম। তখন নারী শিক্ষা মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম আমি।

একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে হেঁটে হেঁটে মুজিবের সঙ্গে গিয়েছি শহিদ মিনারে ফুল দিতে। মুজিব বলেছে, আহা আমার বোনটা, আমার আপাটা এরকম করে হেঁটে যাবে? আপা, আপনি হেঁটে যাবেন না। আপনি রিকশায় যান। আমরা হেঁটে যাই।

আমি বলেছি, না ভাই, আমি হেঁটেই যেতে পারব। এভাবে মুজিবের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে মিটিংয়েও যোগ দিয়েছি। আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। মুজিব সব সময় আমাকে বড়ো বোনের মতোন আগে আগে সঙ্গে রেখেছে। রাস্তায় দেখা হলে গাড়ি থামিয়ে বলেছে, আপা, শিগগির আসেন। গাড়িতে আসেন। আমি বলেছি, না ভাই এইটুকুন পথ তো–এইখান থেকে এইখানে হেঁটে যেতে পারব। মুজিব বলেছে, না আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। ড্রাইভারকে বলেছে, আমার বোনকে আমার বোনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসো।

মুজিবের বাড়িতে গিয়েছি। শত মিটিং হলেও মুজিব এসে বলেছে, আপনি এসে আমাকে খবর দেন কেন? আপনি সরাসরি আমার কাছে চলে আসবেন। আপনি এসে কেন নিচে বসে থাকেন? আমার বাড়ি আপনার বাড়ি। আমি আপনাকে বড়ো বোন বলে মনে করি।

মুজিব প্রতিদিন ভোরবেলা তার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে এক চক্কর দিত। একদিন আমাকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, গতকাল মনে হলো যে আমার বাড়িতে তো পিঠা হচ্ছে আপাকে একটা ডাক দেব নাকি? কিন্তু অত ভোরে আপাকে আর ডাক দিলাম না। তার আন্তরিকতা এমন ছিল যে আমাকে নিয়ে পিঠা খাওয়াবে।

আমার মেয়ের স্বামী আবদুল কাহার চৌধুরী চাটগাঁ রেডিয়োর অফিসার ছিল। একাত্তর সালে পাকবাহিনীর হাতে মারা যায়। দেশে ফেরার পর মুজিব এ ঘটনা শুনল। বলল, কই দুলু কোথায়? আমার মেয়ে বিধবা হলে যেরকম কষ্ট পেতাম, ওর জন্যও আমি সেরকম কষ্টবোধ করছি। দুলু যা চায়, আমি ওকে সব দেব।

আমি বললাম, হাজারো মানুষ এরকম গেছে। আমার জামাইও গেছে। তার জন্য শুধু দোয়া করো।

মুজিব আবার বলল: আপা, আমি আপনার কাছে হাতজোড় করে বলছি, আপনি বলেন দুলুকে আমি কী সাহায্য করতে পারি?

আমি বললাম, ভাই রক্তের বিনিময়ে আমার মেয়েকে কিছু দিতে হবে না। দেশের হাজারো মেয়ের মতো আমার দুলুও বিধবা হয়েছে। অনেক বিধবা তো আমার আশ্রয়েই রয়েছে। ওদের জন্য শুধু দোয়া করো।

তারপর যখন সে রাষ্ট্রপতি হলো, আমাকে বলেছে–একবার এসে আমাকে দোয়া করে যান। গাড়ি পাঠাল। আমি গেলাম। ওই প্রথম যাওয়া। ওই শেষ যাওয়া তার প্রেসিডেন্ট হাউজে।

তখন বাকশাল গঠিত হয়েছে। মুজিব বলল, একটা লোক পাচ্ছি না , যাকে আমি বাকশালের ভার দেব। আপা, আপনি যদি রাজি হন তবে বাকশালের সভানেত্রী হয়ে থাকুন। আপনি যেরকম বলবেন, সেরকমই হবে। আমি বললাম, ভাই আমি রাজনীতি বুঝি না। আমাকে মাফ করো।

আমি তার সেই বাকশালে গেলাম না। কিন্তু যখনই কোনো মিটিং হয়েছে আমি মুজিবের সঙ্গে গিয়েছি। আগেও আমাকে বলেছে, আওয়ামী লীগের মহিলা কমিটি গঠন করব। সেখানে আপনি সভানেত্রী থাকুন। সব সময় আমাকে সে সম্মানের পদ দিতে চেয়েছে। আমি বলেছি, ভাই রাজনীতির মধ্যে আমি যাব না। অন্য যা বলবে আমি করতে পারব। রাস্তায় নামতে পারি কিন্তু রাজনীতির কোনো সংশ্রবে আমি থাকব না।

তখন মুজিব বলেছে, আপা, আপনাকে আমি মাথায় রাখব না আপনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করব? আমি আপনার কাছে মিনতি করছি।

আমি বলেছি, ভাই, আমিও মিনতি করছি। ধানমন্ডিপাড়ায় মুজিবের আগে আসি আমি। তাকে গ্রেফতারের সময়গুলোতে তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার বউ একটা বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। এই দুর্দশার ভেতর দিয়ে মুজিবুর রহমান নেতা হয়েছে। মুজিবের ত্যাগের কোনো সীমা নেই। তার নিষ্ঠার কোনো পরিসীমা নেই। দেশকে যে সে কতখানি ভালোবাসত, তার পরিমাণ কোথাও নেই। মানুষের জন্য মমত্ববোধ, আত্মার একটি টান তার ছিল।

> দেখেছি মুজিবের স্ত্রী অবিচল মুখে কাপড়, বিছানা-বালিশ গুছিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। বলেছে, আপনার ভাই তো জেলে গেছে। বেচারি খুব ধৈর্যের সঙ্গে সংসারটাকে টেনেছে। বাপকে জেলে নিয়ে গেছে বলে কোনো স্কুল হাসিনাকে ভর্তি করবে না, এমনও দিন গেছে

আজকের দিনে তার মতো একটি মানুষ সারা বিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। পলায়নী মনোবৃত্তি ছিল না মুজিবের। যেখানে সংকট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত দেখেছে, সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করেনি। তার পেছনে লক্ষ জনতা 'মুজিব ভাই' বলে লাফিয়ে পড়েই না এ দেশকে স্বাধীন করেছে।

বাঙালি আমাকে মারবে না–মুজিবের এই প্রবল বিশ্বাস ছিল বাঙালির ওপর। সেই বাঙালির হাতে মুজিব হত্যা হয়েছে। এ বাঙালি জাতির সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে, আমি জানি না। মুজিবকে আমি সারা অন্তর দিয়ে এখনো উপলব্ধি করি। সে যা দিয়ে গেছে–সোনার বাংলা; সেই সোনার বাংলায় এখন যারা আগুন জ্বালাচ্ছে, তাদের ধিক্কার দেওয়ার মতোন ভাষা আমার নেই। মুজিবের দেশপ্রেমের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপ্ত হোক–এই প্রার্থনা করি আমি আল্লাহর কাছে।

লেখক: প্রয়াত নারীনেত্রী

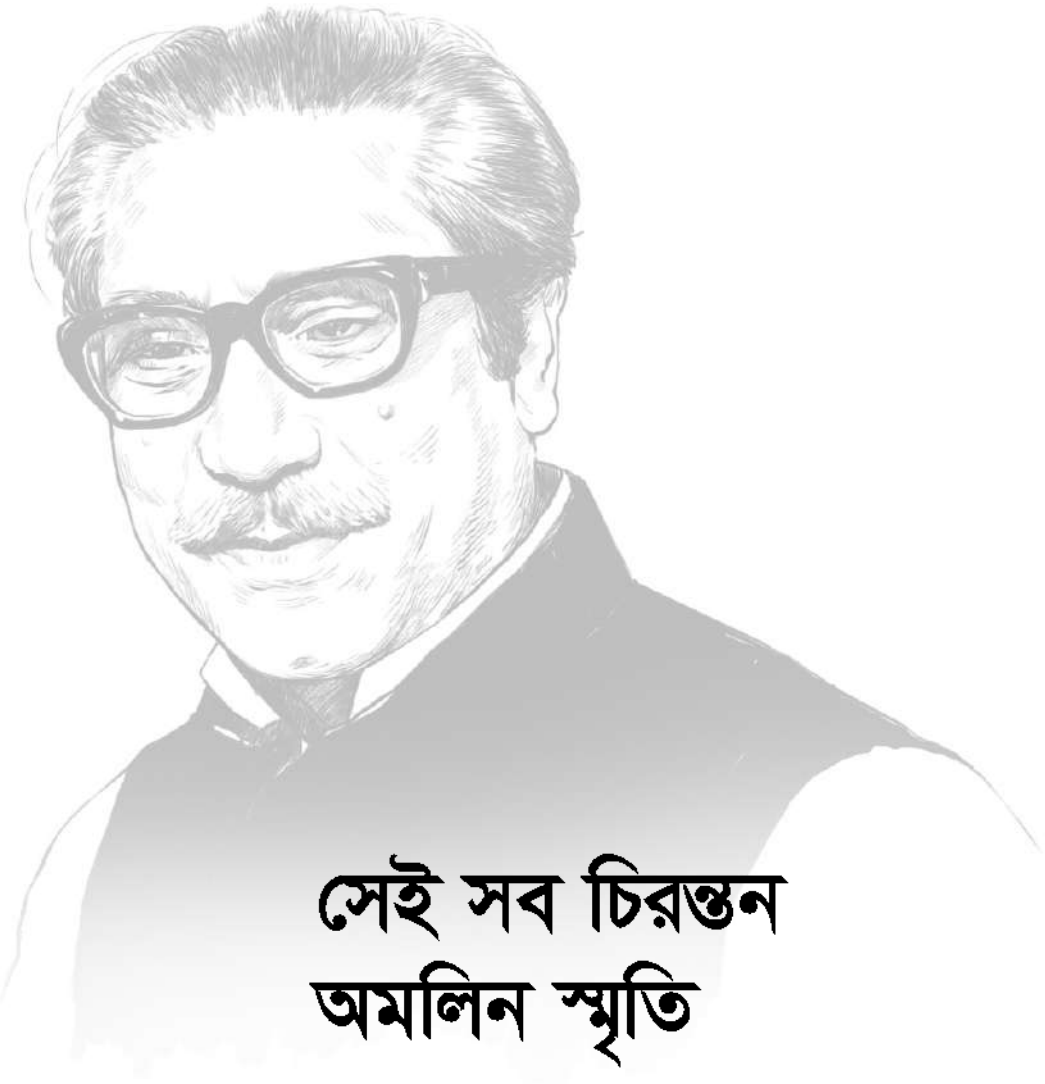

সেই সব চিরন্তন অমলিন স্মৃতি

ওবায়েদ-উল-হক

আব্রাহাম লিংকন সম্পর্কে ইমার্সন বলেছেন, 'His heart was as great as the world, but there was no room in it to hold the memory of a wrong.'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণ করতে গেলেই কথাটা মনে পড়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর বিশাল হৃদয়ে সামান্য অন্যায়-অবিচারের ঠাঁই ছিল না। তাঁর সারা অন্তর ছিল অসীম মহত্ত্ব, অবর্ণনীয় নম্রতা-ভদ্রতা, অপরিসীম ভালোবাসা এবং এমনই মানবিক গুণাবলিতে ঠাসা। তাঁর মনজুড়ে ছিল বাংলা ও বাঙালি প্রেম এবং স্বদেশকে মুক্ত করার দুর্জয় সংকল্প।

মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ফাঁসির মঞ্চে যিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন, স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মুক্তির সংগ্রামী সংগীত গেয়েছেন, তাঁর মানবপ্রীতি ও জনদরদের কিছু কিছু স্মৃতি আজ মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে।

বাহাত্তরের কথা। একদিন সকাল ১০টা-১১টার দিকে বঙ্গবন্ধু পুরোনো গণভবনের নিচতলায় বড়ো কক্ষটিতে বসে কথা বলছেন।

আমিও সেখানে ছিলাম। হঠাৎ একজন জানাশোনা মানুষ সেখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাঁটুতে মাথা রেখে হু-হু করে কাঁদতে লাগল। তিনি তার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন এবং বলছেন, কী হয়েছে বল। সে পরে কান্না থামিয়ে বলল, খানসেনারা আমার থাকার ঘর পুড়িয়ে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর চেহারা বেদনা-মলিন চোখ ছলছল। ধরা গলায় বললেন, অমানুষ দুশমনরা দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে গেছে। এই ছাইভস্ম থেকে আমরা সোনার বাংলা গড়ব। তারপর গৃহনির্মাণ ব্যয় বাবদ তাকে কয়েক হাজার টাকা দেওয়া হয়।

ভাবলাম কবির কথা–নতুন করিয়া গড়িব আমরা ধুলায় তাজমহল। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ধুলায় তাজমহল গড়ার কঠিন কাজ তাঁর। স্বাধীনতাসংগ্রামের পর এবার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং নতুন করে দেশ গড়ার সংগ্রাম। বাহাত্তর সালেই একদিন ধানমন্ডির ৩২নং বাড়িতে আমরা বসে আছি। বঙ্গবন্ধুও আছেন। এক তরুণী সেখানে এসে বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির কন্যা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন বলে অনেকের ধারণা। বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তরুণীটি কেঁদে কেঁদে বললেন, তার বাবাকে জেলে নেওয়া হয়েছে। তাকে মেরে ফেলা হবে না তো? বঙ্গবন্ধু বললেন, নিরাপত্তার জন্যই তাকে জেলে নেওয়া হয়েছে তারই অনুরোধে। বাড়িতে তিনি নিরাপদ ছিলেন না। আর বিনা বিচারে কাউকে কোনো দণ্ড দেওয়া হয় না। আমিও কন্যার পিতা। বাবার জন্য তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারি মা। তরুণীটি তার বুকে মাথা রেখে পিতৃস্নেহের স্পর্শ পেয়ে কাঁদল। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে সে তাকে কদমবুসি করে চলে গেল। বঙ্গবন্ধু বললেন, ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হলে ক্ষমার বিধান আল্লাহই দিয়েছেন। ঠিকমতো তওবা করে নিষ্পাপ হওয়া যায়।

আরেকদিন পুরোনো গণভবনে সেখানকার স্টাফের একজন বঙ্গবন্ধুর হাতে একখানা কাগজ দিল। তিনি তাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, যুদ্ধের সময়ে কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ওদের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কিছু কাজ করেছে। হুমকির মুখে এ রকম হয়ে থাকতে পারে। শত্রুদের নজরবন্দি থেকে তাদের হুকুম অমান্য করতে পারেনি। এখনো যদি বিরুদ্ধাচরণ করে তবে নালিশ করো। ভ্রান্তদের রিক্লেইম করাই তো দণ্ডদানের মূলনীতি। তিনি যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন তার পেছনেও এই যুক্তি, নীতি ও দর্শন কাজ করেছিল। প্রমাণিত যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করা হয়নি। যারা অতীতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে সৎ নাগরিক হিসাবে জীবনযাপনের অঙ্গীকার করবে, কেবল তারাই এই ক্ষমার যোগ্য হবে।

নিয়ন্ত্রণাতীত পরিস্থিতি ও অবস্থার শিকার পথহারাদের ঠিক পথে ফিরে আসার যাচিত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যারা এই সুযোগের অপব্যবহার করেছে তারা বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন অপরাধী এবং কোনো প্রকার ক্ষমার যোগ্য নয়। এতে অপরাধীর দুর্বৃত্ততা প্রমাণিত হয়, ক্ষমাকারীর মহত্ত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।

এই একই মানবিকতার প্রকাশ আমরা দেখেছি বাহাত্তরের ১০ই জানুয়ারিতে যেদিন পাকিস্তানের বধ্যভূমি থেকে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জাতির পিতা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে এসে তার অশ্রুসিক্ত ভাষণে বলেছিলেন, অনেক রক্তপাত হয়েছে আর রক্ত নয়। তার সেই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত ভাষণে যে রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও স্টেটসম্যানসুলভ প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া গেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। খন্দকের যুদ্ধ জয়ের পর মহানবি (সা.) বলেছিলেন, এখন মুসলিমদের মতো অমুসলিমদের জানমাল রক্ষা করাও আমার দায়িত্ব। সেদিন বঙ্গবন্ধু যদি বলতেন তারা আমাদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। এবার বদলা লও, প্রতিশোধ নাও। তবে তখন বাংলাদেশ রক্তবন্যায় নিমজ্জিত হতো, সারা দেশে দোষী ও নির্দোষের লাশের পাহাড় জমে উঠত। বঙ্গবন্ধুর মতো অত্যুন্নত, মহৎ নেতার কারণেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা এড়াতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর মতো আরেকজন মহৎ নেতার অভাবে দেশে এখনো রক্তস্রোত বন্ধ হয়নি। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ববোধ না থাকায় শহিদের মিছিল থামছে না। আজীবন বিরুদ্ধশক্তির নিপীড়ন-নির্যাতন, জেল-জুলুম সহ্য করে বাংলা ও বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে যিনি দেশকে স্বাধীন করার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেই বঙ্গবন্ধু দেশ ও দেশবাসীকে ভালোবেসে নিজের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করেননি। যারা গড়ার কষ্ট করেনি, তাদের এই ভালোবাসা থাকার কথা নয়।

গভীর বিষাদক্লিষ্ট পঁচাত্তর সালে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স নগরে। সেখানে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশও তাতে যোগদান করেছিল। তাঁর অন্টুজে আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সম্মেলন উপলক্ষ্যে নির্মিত বিশাল প্রাসাদোপম ভবনটিকে খুব মনোরম সাজে সাজানো হয়েছিল। ভবনের সামনে বিভিন্ন দেশের পতাকার সারিতে সুউচ্চ দণ্ডে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন সেই ভবনের সম্মুখে গাড়ি থেকে নামলেন, তখন স্বাগতিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বুমেদিন, কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, কাম্বোডিয়ার প্রিন্স সুহানুক প্রমুখ বিশ্বনেতা যেভাবে তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অভ্যর্থনা জানালেন, তা দেখে সর্বাঙ্গে যে মহানন্দের শিহরণ জেগেছিল তা অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয়।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের দুশোর্ধকাল পেরিয়ে সেই প্রথম স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হওয়ার গর্বে বুক স্ফীত হয়ে উঠেছিল। এই গর্ববোধ ছিল যে, মহান নেতার অশেষ ত্যাগের কারণে বিদেশের মাটিতে তার অভূতপূর্ব সম্মান লাভের দৃশ্য দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

তারপর একদিন আমরা সুন্দর আলজিয়ার্স শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। ফিরতে বেশ দেরি হয়েছিল। আসলে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে দেশের মাতৃভাষা আরবি ফরাসি কলোনি ছিল বলে দ্বিতীয় ভাষা ফ্রেঞ্চ। ফ্রেঞ্চ আবার আমাদের কাছে হিব্রু। তাদের কোনো কথাই সহজে বোঝাতে পারছিলাম না। ফলে যথাস্থানে পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। ওদিকে রাত বাড়ছে দেখে বঙ্গবন্ধু অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বারবার খোঁজ নিচ্ছিলেন। ফিরে এসে যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, ভয়ে ভয়ে বলা বাহুল্য, তখন তিনি আমার দু'কাঁধে হাত রেখে বললেন, উঃ চিন্তামুক্ত হওয়া গেল। এতক্ষণ যা দুর্ভাবনায় রেখেছিলেন।

সবার জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা। সবার কুশলে কুশল মানতেন। জেলখানায় তাঁর জন্য খাবার পাঠাতে হতো মস্তবড়ো টিফিন ক্যারিয়ারে। জেল-সাথীদের ফেলে একা খাবেন না, তাই। একা তিনি অনেক বড়ো হতে পারতেন। এমন চিন্তা মনে ঠাঁই দেননি কখনো। সবার সঙ্গে সবার মাঝে, সবার জন্য তাঁর বাঁচা। তিনি সবার বন্ধু। তিনি বঙ্গবন্ধু।

লেখক: প্রয়াত সাংবাদিক

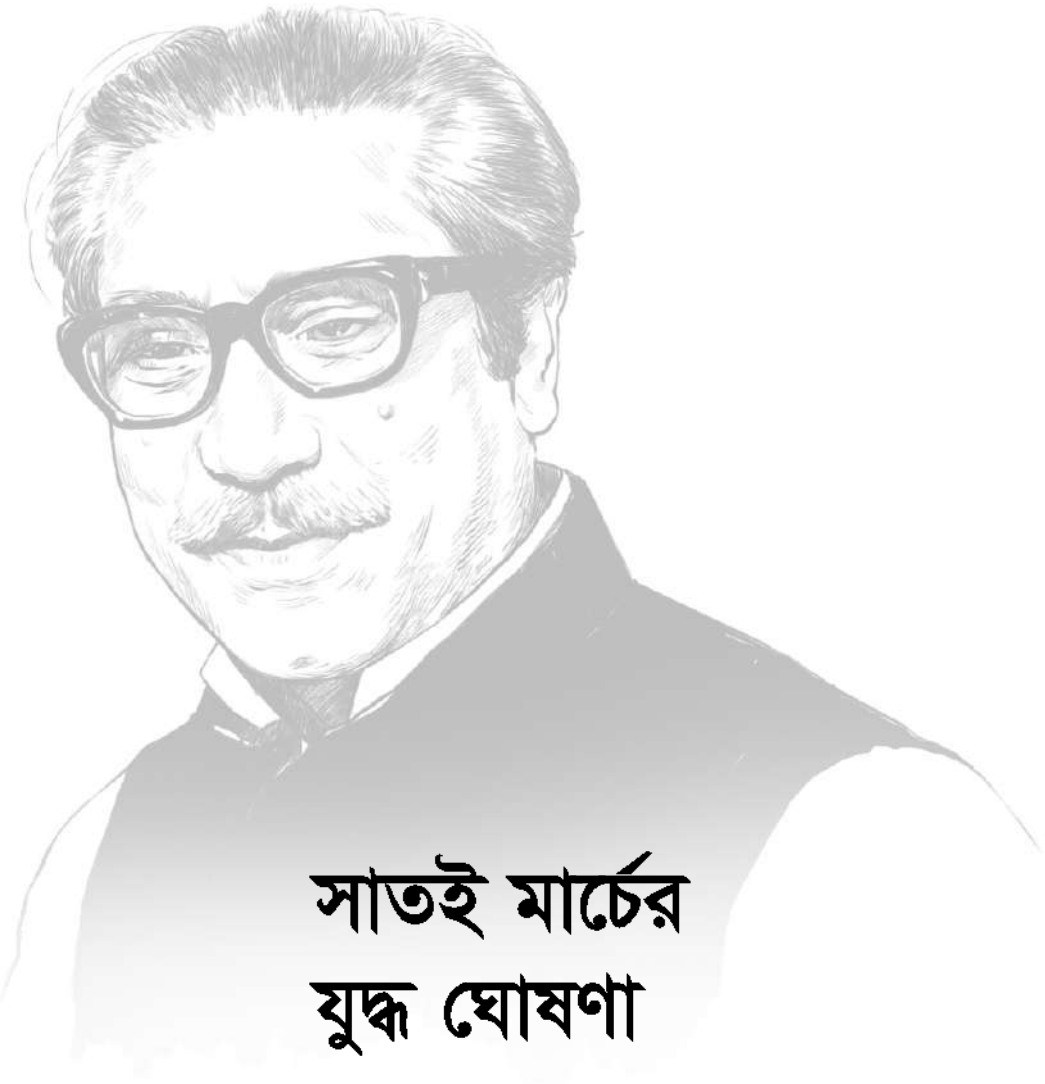

সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা

এ বি এম মূসা

ইতিহাসের তিনজন মহানায়কের তিনটি ভাষণের আমি অপূর্ব মিল দেখতে পাই– মার্কিন গণতন্ত্রের পথনির্দেশক আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণ, ব্রিটিশ জাতির সংকটকালীন উইনস্টন চার্চিলের যুদ্ধকালীন একটি বেতার ভাষণ ও বাঙালি জাতির মুক্তি নির্দেশনা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের সাতই মার্চের উদাত্ত আহ্বান। লিংকন তাঁর ভাষণটি দিয়েছিলেন গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত আমেরিকানদের জাতি গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়ে, চার্চিল ব্রিটনদের জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিহত করতে উদ্দীপ্ত করেছিলেন আর বাঙালি জাতির নেতা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য। আব্রাহাম লিংকন মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পথনির্দেশক বলে পরিচিত। প্রায় একশ বছর পর আমেরিকা এরকম আরেকজন মাত্র প্রেসিডেন্ট পেয়েছিল, যাকে বিশ্ববাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি হচ্ছেন জন এফ কেনেডি। লিংকন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তিটি করে গেছেন

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করে। গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল– জনগণের জন্য, জনগণ পরিচালিত জনগণের সরকার। তবে তাঁর ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গ্যাটিসবার্গে প্রদত্ত ভাষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা, একটি নতুন জাতিসত্তা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বলেছিলেন, 'এ নিউ নেশন' একটি নতুন জাতির কথা, যে জাতি সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে মুক্তির মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে, 'এ নিউ বার্থ অব ফ্রিডম'-এর কথা। সেদিন তার এই আহ্বান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রচনায় সহায়ক। স্যার উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক ছিলেন। যিনি বলেছিলেন, 'ওভার মাই ডেড বডি', আমার লাশের ওপর ভারত স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁর সেদিনকার নেতৃত্ব ছিল অনবদ্য ও অসামান্য। হিটলারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে। বলেছিলেন, 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করব।' বিবিসি থেকে ১৯৪০ সালের ৪ জুন তিনি তাঁর ভাষণে দেশবাসীকে দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য সিইজ, অ্যান্ড ওশেনস, জলে-স্থলে, সমুদ্রে-সৈকতে আমরা যুদ্ধ করব। হোয়াটেভার মে বি দ্য কষ্ট, যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করব, আমরা আত্মসমর্পণ করব না।'

কী অদ্ভুত মিল রয়েছে এই দুটি ভাষণের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের। তবে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি ছিল আমার মতে আরও অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, অধিক গতিময়, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাষার মাধুর্যে ও বাক্যবিন্যাসে অনেক মধুর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, স্বল্পকথায় অনেক কিছু বলেছেন। আজকে সেই ভাষণের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, এর বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ভাষণটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটা চরণ নিয়ে একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কেন এই ভাষণটিকে ঐতিহাসিক বলা হবে, এই উপমহাদেশের ইতিহাস কীভাবে পালটে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান।

> সংগ্রামের ডাক দেওয়ার আগে তাঁর দুটি বক্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' আর বলেছিলেন 'তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর'

কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে ৭ মার্চের ভাষণ? স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রতিরোধের আহ্বান মুক্তির পথনির্দেশনা? কারও কারও মতে, ২৬ শে মার্চ নয়, সেদিন রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এর সপক্ষে প্রায়ই উদ্ধৃতি করা হয় সেই দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই যে সংগ্রামের কথা বললেন, তার মানে কী তা-ই আগে বিশ্লেষণ করা দরকার। সংগ্রাম বলতে আমরা বারবার বুঝে এসেছি অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই, আন্দোলন, সভা-শোভাযাত্রা, এমনকি হরতাল ও অসহযোগ। আবার সংগ্রামের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'যুদ্ধ'। সংগ্রাম বলতে একসময় সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কথাও বোঝাত। বঙ্গবন্ধু যে সংগ্রামের কথা বলেছেন, তা কি আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিপ্লব, স্বাধীনতা ঘোষণা? সম্প্রতি কোনো কোনো মহল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে তার জবাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স নয়, ডিক্লারেশন অব ওয়ার। রেসকোর্সের ভাষণ ছিল অস্ত্র নিয়ে। লড়াইয়ের আহ্বান, সমগ্র বক্তব্য যদি পুরোপুরি একসঙ্গে পড়া হয়, তাহলে এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। সংগ্রামের ডাক দেওয়ার আগে তাঁর দুটি বক্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' আর বলেছিলেন 'তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর'। স্বভাবতই প্রশ্ন করা উচিত, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কেন? দ্বিতীয়ত, কেন সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে? এর মানে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হলো, এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শত্রু বলতে নিশ্চয়ই একটি প্রতিপক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই প্রতিপক্ষ কোত্থেকে এলো যদি যুদ্ধই না বাধে? সোজা কথায়, তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। এ কারণেই আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে, ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন, যে যুদ্ধ ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। ভাষণটির আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, অতীতের ভাষণগুলো থেকে এর উপস্থাপন ছিল ভিন্নতর! যারা ভাষণটি শুনে থাকেন তারা নিশ্চয়ই মনঃসংযোগ করে বুঝতে পারবেন, অতি ধীরেসুস্থে বক্তব্য শুরু করে তিনি একসময়ে চরমে পৌঁছেছেন, ক্লাইমেক্সে গিয়ে বলেছেন, 'এই দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব'। তার আগে স্বল্পকথায় তিনি একটি ইতিহাস বিবৃত করেছেন, রাজনৈতিক পটভূম দিয়েছেন। তারপর প্রস্তুতির কথা বলেছেন, সবশেষে একটি আহ্বান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছেন। মাঝে আছে পথনির্দেশনা, ভবিষ্যতের কর্মসূচি। 'যদি আমি হুকুম দেবার নাও পারি' তখন কী করতে হবে, তা-ও বলেছেন, অর্থাৎ সেনাপতি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা গ্রেফতার হন, তাহলে কী করতে হবে, তা-ও বলে দিয়েছেন। উইনস্টন চার্চিলের মাঠে-ঘাটে, সমুদ্রতীরে যুদ্ধ করার মতো বলেছেন, 'ভাতে মারব, পানিতে মারব'। তাই তো ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার ডাক নয়, একটি যুদ্ধ ঘোষণা। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের নির্দেশনা। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তিনি সরাসরি বললেন না কেন যে সেদিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন? বস্তুত, এই প্রশ্নটি সেদিনই উঠেছিল, পরেও উঠেছে। ভাষণটি দেওয়ার আগেও অনেক আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে, রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন। ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন বাতিল ঘোষণার পর যখন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই যা বলার বলব, তখনো সবাই এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক, সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও ধরে নিয়েছিলেন, হয়তো

এক যুগান্তকারী দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেওয়া হবে রেসকোর্স ময়দানে। পাঁচ লাখ নর-নারী সেদিন উল্লাস করে, শোভাযাত্রা করে, নেচে-গেয়ে ময়দানে হাজির হয়েছিলেন একটিমাত্র কথা শোনার জন্য, সে কথাটি ছিল–'স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম'। এমনকি সভা শুরু হওয়ার পূর্বলগ্ন পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করার পূর্বমুহূর্তেও এ নিয়ে ছিল চাপা উত্তেজনা। তদুপরি তিনি সভাস্থলে আসতে দেরি করছিলেন, ৩২ নম্বরে বসে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন, জঙ্গি নেতারা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে, এসব খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু এলেন, পাঁচ লাখ জনতার দিকে তাকালেন, তাদের মনের খবর কি তাঁর অজানা ছিল? তাদের চাহিদা ও মনোবাসনা কি তিনি অনুধাবন করতে পারেননি? পেরেছিলেন, আবার এ খবরও তিনি রাখতেন তার সেদিনের বক্তব্য পাকিস্তানের ইতিহাস শুধু পালটে দেবে না। পাকিস্তানি শাসকদের মাঝে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কী বললে কী হবে, পাকিস্তানিরা সেই মুহূর্তে যা করবে, তাও অনুমান করেছিলেন। শুধু সুদূরপ্রসারী নয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথাও তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। তারপর তিনি ধীরলয়ে ভাষণ শুরু করলেন, স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে তাঁর ভাষণ এগিয়ে চললো, স্বরের উত্থানপতন হতে লাগল। সেদিন যারা পাঁচ লাখের শামিল ছিলেন, তারা সেই নাটকীয় পরিস্থিতি স্মরণ করতে পারেন। তাঁর বক্তব্য অতীত থেকে বর্তমানে এলো, তারপর ভবিষ্যতের দৃঢ়প্রত্যয়ের ঘোষণা–'এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব।'

সেদিন রেসকোর্স ময়দান থেকে যারা ফিরে গেল, তাদের কারও কারও মাঝে কি একটু হতাশাও ছিল না? ছিল বৈকি; কারণ তারা একটি সুনির্দিষ্ট আওয়াজ, 'এখনই স্বাধীনতা, এই মুহূর্তে পূর্ণ মুক্তি চাই,' এ কথাগুলো শুনতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক ছিলেন না এবং স্বাধীনতা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার নয়–এই দেওয়া-নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র লেনদেন যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত সুখকর হয়নি। তাছাড়া সাতই মার্চের আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে, যেদিন ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার সবুজ-লাল সূর্যের মাঝে আঁকা মানচিত্র পতাকা উড়ছিল, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকার চলছিল, অফিস-আদালতে ও ব্যবসা-কলকারখানায় কাজ চলছিল। সাতই মার্চের ভাষণে তাই বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন, রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব।' এই রক্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মার্চের প্রথম থেকেই যে স্বাধীনতা কায়েম হয়েছিল, তা স্থায়ী করার জন্য। দেশকে মুক্ত করতে নয়, আসলে মুক্ত রাখতেই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল পঁচিশে মার্চের কালরাত্রি থেকে। পঁচিশে মার্চের রাতে আমাদের স্বাধীনতার ওপরই হামলা হয়েছিল। সাতই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারি যুদ্ধেরই আভাস দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই তো সাতই মার্চের ভাষণ পড়তে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে আবেগ দিয়ে নয়, একাত্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও ব্যঞ্জনাকর উপলব্ধি করতে হবে।

লেখক : প্রয়াত সাংবাদিক

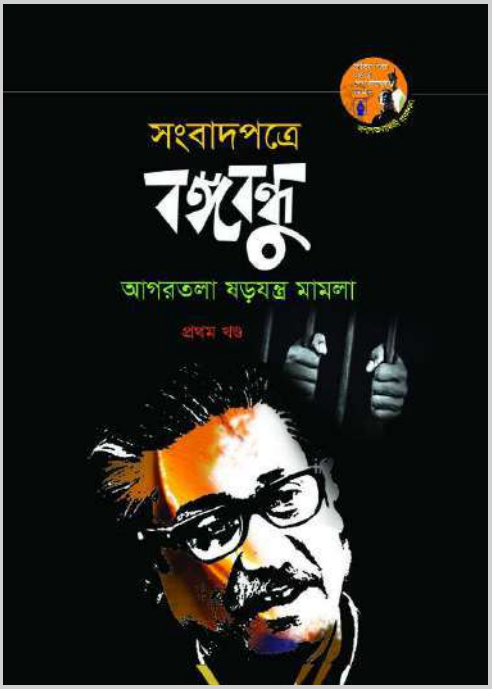

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

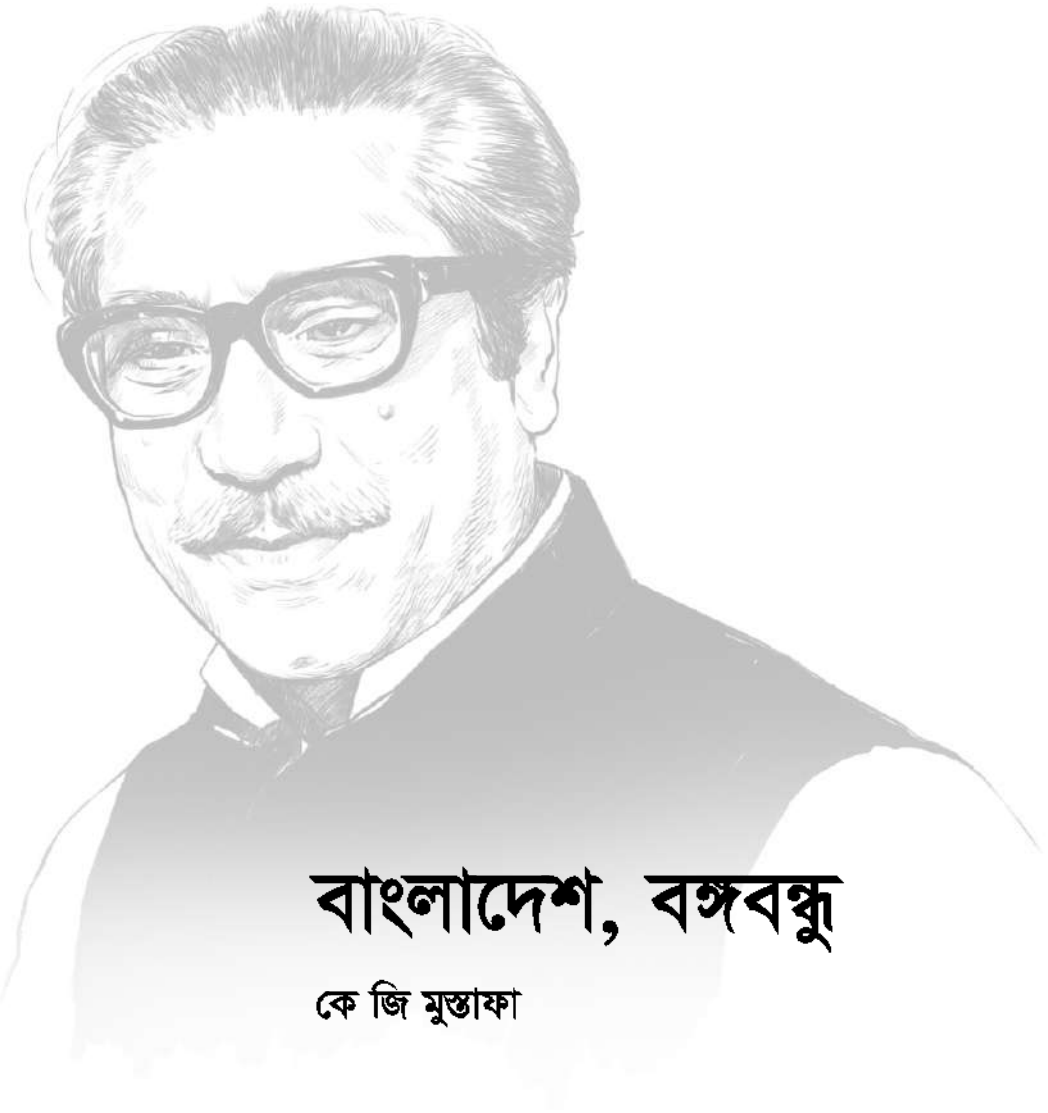

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু

কে জি মুস্তাফা

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস। এ ইতিহাস গড়ে উঠেছে বাংলার বঞ্চিত দলিত মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুরক্ষার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৪২-৪৪ সালে যে মহাদুর্ভিক্ষ অবিভক্ত বাংলার জনসাধারণকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করেছিল, সেই দুর্ভিক্ষই তাদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জনের পথপ্রদর্শন করেছিল। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় মুসলিম লীগের কর্ণধার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেননি। দেশবাসী এটা ভোলেনি।

বাংলার এই ক্রান্তিকালে যুবসমাজ ধ্বংস ও মৃত্যুকে খুব কাছে থেকে দেখেছে। তারা দেখেছে, উপনিবেশবাদী শক্তি দেশীয় মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে কীভাবে চরম বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এই অভিজ্ঞতাই

সেদিনের তরুণসমাজকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে ব্যাপকভিত্তিক মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তুলতে শিখিয়েছে। এই সংগ্রামী তরুণদের মধ্য থেকেই উঠে আসেন পরবর্তীকালের মহান নেতা, যাঁর আজীবন সংগ্রামের ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্বাধীন দেশ। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের লাহোর অধিবেশনে ২৩ মার্চ, '৪০ প্রস্তাব বাংলার মুসলিম যুবসমাজকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম আসাম-বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় নির্বাচনের পর সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ সাংসদদের দিল্লি কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে আসে একটিমাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক নেতারা প্রতিবাদমুখর হন।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় শুরু হয় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা শান্তি মিছিল নিয়ে কংগ্রেস নেতা ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়িতে দাঙ্গাকারীদের হামলা প্রতিহত করে। সেদিনের এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছাত্র অবিসংবাদী নেতা আসনটি অর্জন করেন। ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার ব্যবস্থাসহ ভারত বিভাগ পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করে। বাংলা বিভাগের আয়োজন প্রতিহত করার সব রকম প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর সারা দেশের সমমনা ছাত্রনেতারা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সমবেত হন কলকাতার সিরাজুদ্দৌলা হোস্টেলে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে পূর্ববঙ্গ সর্বপ্রকার বৈষম্যের শিকার হবে। ছাত্রনেতারা মনে করেন, পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তৎপর হবে–এমন কোনো সম্ভাবনাও নাই, এ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার জন্য ঢাকায় একটি সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ছাত্র ও যুবকদের ব্যাপকভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সময় আসাম থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কলকাতা এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং পাকিস্তানে সরকারি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত হন। দুই নেতার এই ধারণা নিয়ে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র সমমনা ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুজিব পূর্ববঙ্গের প্রতিটি জেলায় সফর করে বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

শেখ মুজিব বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের কাজে ব্যস্ত থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হয়ে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগ। পরের বছর ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। গণতান্ত্রিক যুবলীগ সরকারি নির্যাতনে বেশিদিন টিকতে পারেনি। কিন্তু ছাত্রলীগ দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের সহযোগিতায় বন্দি মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলে।

এদিকে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও রাষ্ট্রভাষার দাবিতে '৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাজপথে আন্দোলন নিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। আন্দোলনের মুখে পূর্ববঙ্গের খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার ছাত্রদের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ওই চুক্তিতে বাংলাকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। কারামুক্তির পর শেখ মুজিব এই ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে আবার আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়। একই বছর ১৯শে মার্চ ঢাকার ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া শুরু হয়। পাকিস্তানে বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষার আন্দোলন, তথা বাঙালির জাতীয় সত্তা বিকশিত করার সংগ্রাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ ধর্মঘট করলে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থক ছাত্র ফেডারেশন কর্মচারীদের দাবির সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবসহ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। মুজিবকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয়। এই দমননীতির মুখে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং সরকার মুজিবসহ ২৫ জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। কর্তৃপক্ষের হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলনের সময় ঢাকা ও অন্যান্য জেলে রাজবন্দিরা দীর্ঘ অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

এদিকে মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালের ২২ ও ২৩শে জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলন আহ্বান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং সম্মেলনে তারা কী ভূমিকা পালন করবেন সে সম্পর্কে নির্দেশ চান। আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্মেলন সফল করার জন্য শেখ মুজিব ছাত্র প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন। সম্মেলনে সারা প্রদেশে মুসলিম লীগবিরোধী নেতা ও কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন। এদের মধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ করেছিলেন। এই সম্মেলনে পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটে। শেখ মুজিব জেলে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে নির্বাচিত করা হয় দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। সেদিন ঢাকার রোজ গার্ডেনের ওই সম্মেলনে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়। যে সমস্ত গুণ একজন রাজনৈতিক নেতাকে শীর্ষপদ লাভ করতে সাহায্য করে থাকে, তার সবই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে। উদ্যম, সাহসিকতা ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল দৃঢ়তা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন মাত্র চার বছরের মধ্যে। এই পদে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সংগঠন গড়ে তোলার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর দলকে পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে সমর্থ হন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার, তিনি বহুসংখ্যক বামপন্থি নেতাকর্মীকে আওয়ামী মুসলিম লীগে টেনে নেন।

পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলো যখন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি নেয়, তখন পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কর্মীদের একাংশকে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করতে উৎসাহিত করে। কমিউনিস্ট পার্টির নীতি পরিবর্তনের রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে শেখ মুজিবের বিলম্ব হয়নি। তিনি ১৯৫২ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান শান্তি পরিষদের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে চীন সফর

করেন এবং তার পরের বছরই পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা এবং সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদকে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় সারা পূর্ব বাংলার বামপন্থি কর্মীরা ব্যাপক হারে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

শক্তিশালী আওয়ামী মুসলিম লীগ নির্বাচনি ঐক্য গড়ে তোলে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করে। এই ফ্রন্টের মূল চালিকাশক্তি ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং তার সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। দলকে আরও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্য ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে। দেশের সব শ্রেণির নাগরিকদের এই দলে যোগদানের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগকে আওয়ামী লীগে রূপান্তরের রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভ করে শেখ মুজিব যথার্থ জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেন।

শেখ মুজিব নিজেকে দলের সাধারণ কর্মীদের কাছ থেকে কখনই দূরে সরিয়ে রাখেননি। প্রয়োজনে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন; কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেননি। মন্ত্রিত্বের চেয়ে দলের কাজ বড়ো, এই রাজনৈতিক সচেতনতা থাকার ফলেই তিনি ১৯৫৭ সালে শিল্পমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসনকর্তা আইয়ুব খান চেয়েছিল শেখ মুজিবকে ধ্বংস করতে। সামরিক সরকার আট আটটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করে একটিও প্রমাণ করতে পারেনি। বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখে বছরের পর বছর বাঙালির এই মহান নেতাকে।

পূর্ব পাকিস্তানসহ সারা পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে ওঠে, তখন কাশ্মীর উদ্ধারের স্লোগান দিয়ে দেশবাসীর ওপর চাপানো হয় যুদ্ধ। যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে দেশের মানুষের সব রকম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ভারতবিরোধী এই যুদ্ধই আইয়ুব খানের কাল হলো। যুদ্ধে কাশ্মীর উদ্ধার তো দূরের কথা, সেখানকার সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো ভারত দখল করে নেয়। ওই যুদ্ধ আরও প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সুরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্ভব নয়। এদেশের মানুষের মনে তখন প্রশ্ন দেখা দেয়, আমাদের আত্মরক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা কী?

প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিকল্প ব্যবস্থা বাতলে দিলেন তাঁর ছয় দফায়, পূর্ব বাংলার মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মুজিবের ছয় দফার আন্দোলনে সারা দেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। বারবার কারারুদ্ধ করেও আইয়ুব খান মুজিবকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়।

এই পরিস্থিতিতে সাজানো হলো তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অসন্তুষ্ট বাঙালি সৈন্যদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করা হয়। কিন্তু ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ উত্তাল আন্দোলনের মুখে ভেসে গেল আইয়ুবী ষড়যন্ত্র। মামলার আসামিরা মুক্ত হয়ে সগৌরবে ফিরে এলেন ক্যান্টনমেন্টের বন্দিখানার বাইরে। বীর মুজিবকে ছাত্ররা ভূষিত করল বঙ্গবন্ধু অভিধায়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭০-এর নির্বাচনি যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের দুটি আসন ছাড়া সব আসনে জয়লাভ করেন। নির্বাচন-পরবর্তী চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। সারা বাংলাদেশ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হানাদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে কারারুদ্ধ করেও যুদ্ধে পরাজিত হয়। বঙ্গবন্ধু ততদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি পান দেশে-বিদেশে।

লেখক: প্রয়াত সাংবাদিক

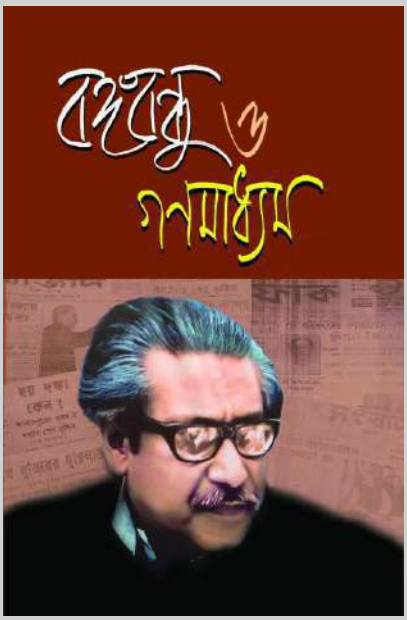

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

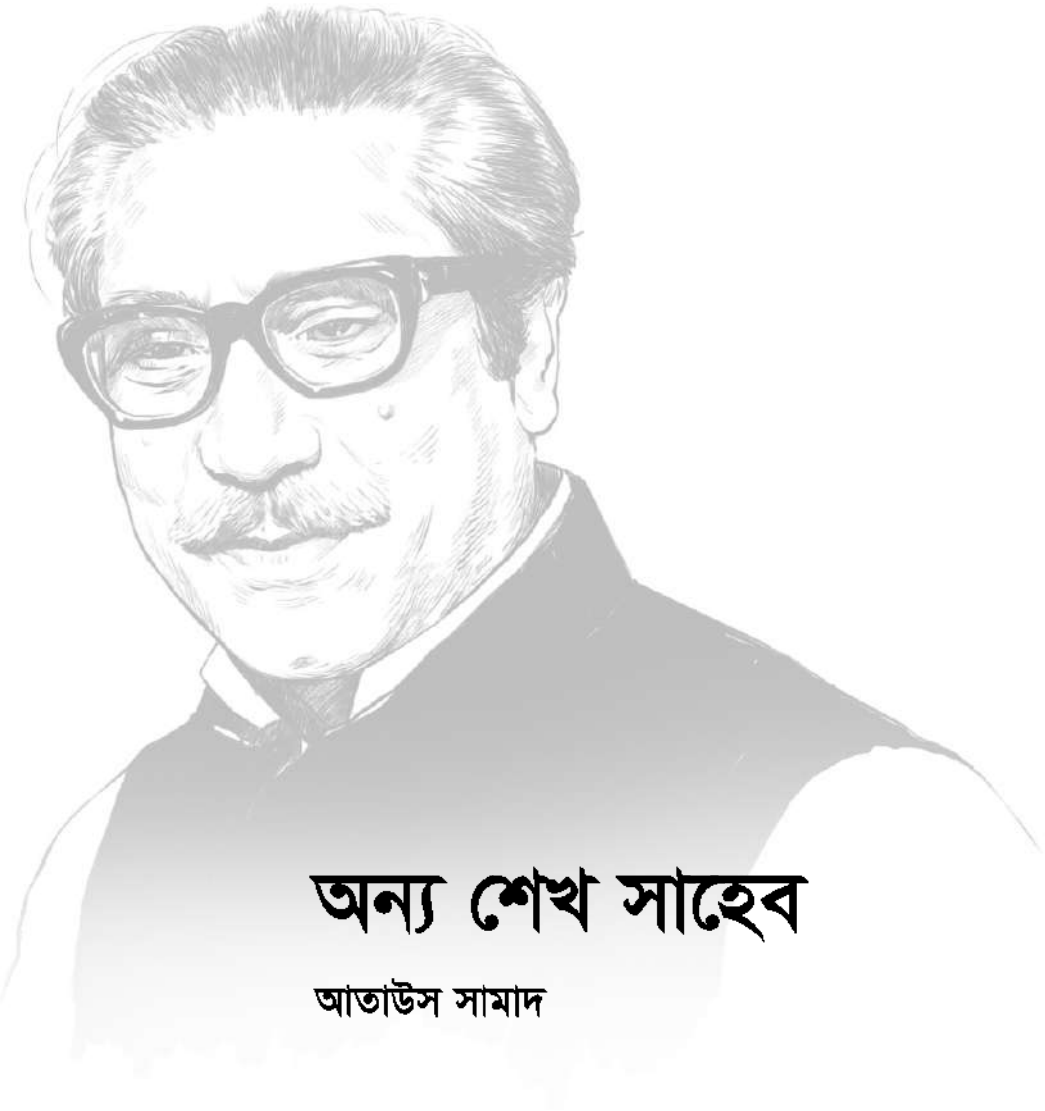

অন্য শেখ সাহেব

আতাউস সামাদ

বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান যখন তার আগে ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের নেতা থেকে সারা দেশের প্রধান নেতা হয়ে উঠছেন, তখন তাঁর সহকর্মী, অনুসারী ও শুভার্থীরা তাঁকে একেকজন একেকভাবে সম্বোধন করতেন। মওলানা ভাসানী তাঁকে ডাকতেন শুধুই 'মজিবর' নামে। শেখ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত এবং পরে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তাঁকে সম্বোধন করতেন 'লিডার' বলে। তাঁর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে তাঁকে উল্লেখ করতেন 'শেখ মুজিব' নামে আর তাঁরা যদি খুব দ্রুত কথোপকথন করতেন, তখন কেউ কেউ বলে ফেলতেন 'শ্যাখ', যেমন 'শ্যাখ কইয়া দিছে'। ষাটের দশকজুড়ে আওয়ামী লীগ ও বাঙালিদের নানান আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হতো প্রায়ই। তখন এসব সম্বোধন নিজের কানে শুনেছি। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত মামলায় পাকিস্তানিরা তাঁকে এক নম্বর আসামি করেছিল। সেই মামলার অভিযোগ ছিল যে, অভিযুক্তরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে

চাইছিলেন। ১৯৬৯ সালের প্রথমে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন এবং পরে সেই আন্দোলনের ফলে ও মওলানা ভাসানী এবং তাঁর সমমনা নেতৃন্দের প্রচেষ্টায় যে গণবিস্ফোরণ ঘটে তার প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ ওই মামলার সব অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পান। এর পরপরই রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্রদের ডাকা বিশাল সংবর্ধনা সভায় ডাকসুর সহসভাপতি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, যিনি বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী, ছাত্রদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ততদিনে এক প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন। সম্ভবত সেজন্যও তাঁকে মানুষ তখন খুবই ভালোবাসত বলে 'বঙ্গবন্ধু' নামটা সবার মনে ধরে যায় এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা তো বটেই, অন্যদেরও মধ্যে অনেকেই তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলে সম্ভাষণ করতে থাকেন। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাঁর ছয়দফা দাবি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবকটি আসনে জয়লাভ করে। সমগ্র পাকিস্তানের ৩০০ আসনের অর্ধেকের বেশি আসনই আওয়ামী লীগের দখলে আসে। সেই সময় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবটি একদিকে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উচ্চারণ এবং অন্যদিকে তাঁর প্রায় আনুষ্ঠানিক পরিচিতিতে পরিণত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও বাংলার মানুষের কাছ থেকে এই ডাকটাই পছন্দ করতেন বলে আমার মনে হয়।

তবে সংবাদ সম্মেলনে আমরা অনেকেই তাঁকে তাঁর ভালো নাম ধরেই সম্বোধন করতাম এবং সেগুলোর বাইরে তাঁকে 'শেখ সাহেব' বলে ডাকতাম। আমিও এদের মধ্যে একজন ছিলাম। এই ডাকটাই এখনো আমার মনে ও মুখে স্বচ্ছন্দে আসে। সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও যখন তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে (ঢাকায় ও দিল্লিতে মুখ্যত সংবাদ সম্মেলনে)। তখনো তাঁকে এভাবেই সম্বোধন করেছি এবং শেখ সাহেবও আপত্তি করেননি।

শেখ সাহেব যখন পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লিতে যাত্রাবিরতি দিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরেন, তখন দিল্লি থেকে তাঁর প্লেনে উঠে তাঁর সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত আসার সুযোগ হয়েছিল। সুযোগ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন এবং বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। দেশ পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার কয়েকদিনের ভেতরেই আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ওই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর প্রথম সরকারি বিদেশ সফর ছিল ভারতে। সেখানে যাওয়ার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল যে দিল্লি থেকে কূটনৈতিক মহলের মাধ্যমে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে আনা। পাকিস্তানের তৎকালীন সরকারপ্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ততদিনে শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তখনো তা কার্যকর করেননি। সেজন্যই তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগ করা দরকার হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ আমাকে তখন রিপোর্টার হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবের সঙ্গে দিল্লি পাঠান ওই সফর সম্পর্কে বাংলাদেশে খবর পাঠানোর জন্য। সেই কারণেই রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের দিল্লি অবতরণের সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম এবং আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবকে ধরে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক স্বদেশযাত্রার জন্য লন্ডনে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের যে কমেট বিমানটি দিয়েছিলেন তাতে উঠে পড়তে পেরেছিলাম।

দিল্লি থেকে ঢাকা আসার পথে শেখ সাহেব বেশির ভাগ সময় কথা বলেন আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে। তাঁদের একান্ত আলাপ ছাড়া অন্য সময় আমি তাঁদের কাছাকাছি বসার সুযোগ পাই। তখন শেখ সাহেব আমাকেও নানান কথা, বিশেষত পরিচিত সাংবাদিকরা কে কোথায় কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। আমিও 'অফ দ্য রেকর্ড' কিছু প্রশ্ন করার ও কিছু কথা বলার সুযোগ পাই।

তবে সেদিন আবদুস সামাদ আজাদ সাহেবের সঙ্গে, কূটনীতিবিদ ফারুক আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে বা আমার সঙ্গে কথা বলার সময় শেখ সাহেব প্রায়ই তাঁর প্রিয় কবিদের কবিতায় বাংলাদেশের যেসব বর্ণনা আছে তার থেকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি আমাদের লক্ষ করে বলে ফেললেন, 'দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, এখন আমি কাঁধে একটা চাদর ফেলে বাংলার হাটে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াব, আমার দেশের মানুষের সঙ্গে গল্প করব এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনব।' দেশের মানুষ যে তাঁকে ভালোবাসে তাঁর এই অনুভূতি ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁরও যে বেশকিছু করণীয় আছে তার একটা প্রমাণ পাই সেই প্লেনের ভেতরই। প্লেনটা যখন ঢাকা বিমানবন্দরের ওপর এসে গেল, তখন একজন এয়ার হোস্টেস (ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সের ভাষায় (WREN) মাটিতে যে অগণিত মানুষ জমা হয়েছিল তাঁকে দেশে স্বাগতম জানানোর জন্য, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্লেনের জানালা দিয়ে তা দেখার জন্য অনুরোধ জানান। সেই এয়ার হোস্টেস বলেছিলেন, 'উই আর নাও অ্যাট ঢাকা, এক্সিলেন্সি ক্যান সি হিজ পিপল থ্রো দ্য পোর্টহোল'। শেখ সাহেব সেই জনতার ঢেউ দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে উঠেছিলেন, 'আমার দেশের মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে। আমি এদেরকে খাওয়াব কীভাবে?' আমি একটু বিস্মিত হয়েই তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মানুষকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার কথা সেই সময় উঠল কেন? আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম তাকে, কারণ আমরা ঢাকা থেকে দিল্লি রওয়ানা হওয়ার আগে ঢাকায় চালের দর সস্তাই দেখে গিয়েছিলাম। শেখ সাহেব বললেন, ঢাকা থেকে লন্ডনে তাঁকে ফোনে জানানো হয়েছে যে বর্বর

"শেষপর্যন্ত তিনি আমাদের লক্ষ করে বলে ফেললেন, 'দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, এখন আমি কাঁধে একটা চাদর ফেলে বাংলার হাটে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াব, আমার দেশের মানুষের সঙ্গে গল্প করব এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনব"

পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের সব খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দিয়েছে। আবদুস সামাদ আজাদ সাহেব ও ড. কামাল হোসেন (তিনিও পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে সপরিবারে শেখ সাহেবের সঙ্গেই লন্ডন আসেন এবং তাঁর সঙ্গেই ঢাকা প্রত্যাগমন করেন) প্লেনের ককপিট থেকে ফেরত এসে গেছেন। ভারতের পশ্চিম বাংলার ওপর দিয়ে প্লেন আসার সময় সেখানকার তৎকালীন গভর্নর শেখ সাহেব কলকাতা নামলেন না এজন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি বেতার বার্তা (ওয়্যারলেস মেসেজ) পাঠিয়েছিলেন। শেখ সাহেব আবদুস সামাদ আজাদ ও ড. কামাল হোসেনকে নির্দেশ দেন যে বেতার মারফত তখনই উত্তর দিয়ে দিতে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই মুহূর্তে কর্তব্য হচ্ছে দেশে ফিরে আসা এবং দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করা। তবে এরপর তিনি বিদেশে প্রথম যেখানে যাবেন তা হবে কলকাতা এবং পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা বাংলাদেশের মানুষকে যুদ্ধের নয় মাস যেভাবে আতিথেয়তা দিয়েছে সেজন্য ধন্যবাদ জানানো। তবে গভর্নর সাহেবও যেন অনুগ্রহ করে এখনই সেখানকার মানুষকে এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে দেন। শেখ সাহেবের সেই বার্তা পাঠিয়ে তাঁরা দুইজন ফেরত আসতেই ঢাকায় প্লেন নামার এবং বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি তাঁর দেশের মানুষের মাঝে গিয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। আমিও নিঃশব্দে শেষদিকের এক কাতারে গিয়ে অবস্থান নিলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হবে শেখ সাহেবের বাংলার নয়নমণি, বঙ্গবন্ধু ও রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পালন। সাংবাদিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা হবে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে এবং আবেগতাড়িত না হয়ে তার সেই সব দায়িত্ব পালন করা, পর্যবেক্ষণ করা ও তা রিপোর্ট করা। তবে আজকে এই লেখার শুরুতেই, শেখ সাহেবকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে সম্বোধন করত– এই কথাটা যে তুলেছি ওই বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তা করেছি আমার নিজের মনের একটা কথা বলার জন্য। সেটা হলো, শেখ সাহেব তো চেয়েছিলেন বাংলার মানুষের সঙ্গে গল্প করতে এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে। সেই সব কথা শুনে তা তিনি রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের বা সরকারকে জানাবেন এবং তাদেরকে সেই মোতাবেক কাজ করতে বলবেন– এমন একটা ভূমিকায় যদি তিনি থাকতেন, তাহলে সেটা কি দেশের জন্য ও তার নিজের জন্য বেশি মঙ্গলজনক হতো নাকি তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের সরকারপ্রধান হওয়াটাই ভালো হয়েছিল?

আমার মনে হয়, দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই সরকারের ও দলের খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা করার মতো একটা দায়িত্বে তাঁকে না বসিয়ে তিনি যাতে ইচ্ছামতো দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারতেন, তাদের কথা শুনতে পারতেন এবং সেই খোঁজখবরের ভিত্তিতে দেশের সমস্যাগুলোর কথা সামগ্রিকভাবে ভেবেচিন্তে সেই মতো ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বলতে পারতেন, তাঁর জন্য এরকম একটা ভূমিকার ব্যবস্থা করতে পারলেই যেন ভালো হতো।

অবশ্য, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই আমাকে দিল্লি চলে যেতে হয় সেখানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালনের জন্য। দেশে ফিরি ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে। মধ্যে যদিও ১৯৭৪ সালে একবার ছুটিতে এসে দেশ ঘুরে যাই, তবুও দেশ থেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন আসলে কী হলে ভালো হতো সে সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও প্রথমে কাছে থেকে, তারপর দূর থেকে আমাদের (অর্থাৎ কয়েকজন সাংবাদিকের মনের) শেখ সাহেব ও বাংলাদেশকে দেখে আমার যা মনে হয়েছে তখন এবং এখন, তা-ই অকপটে তুলে ধরলাম।

লেখক : প্রয়াত সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

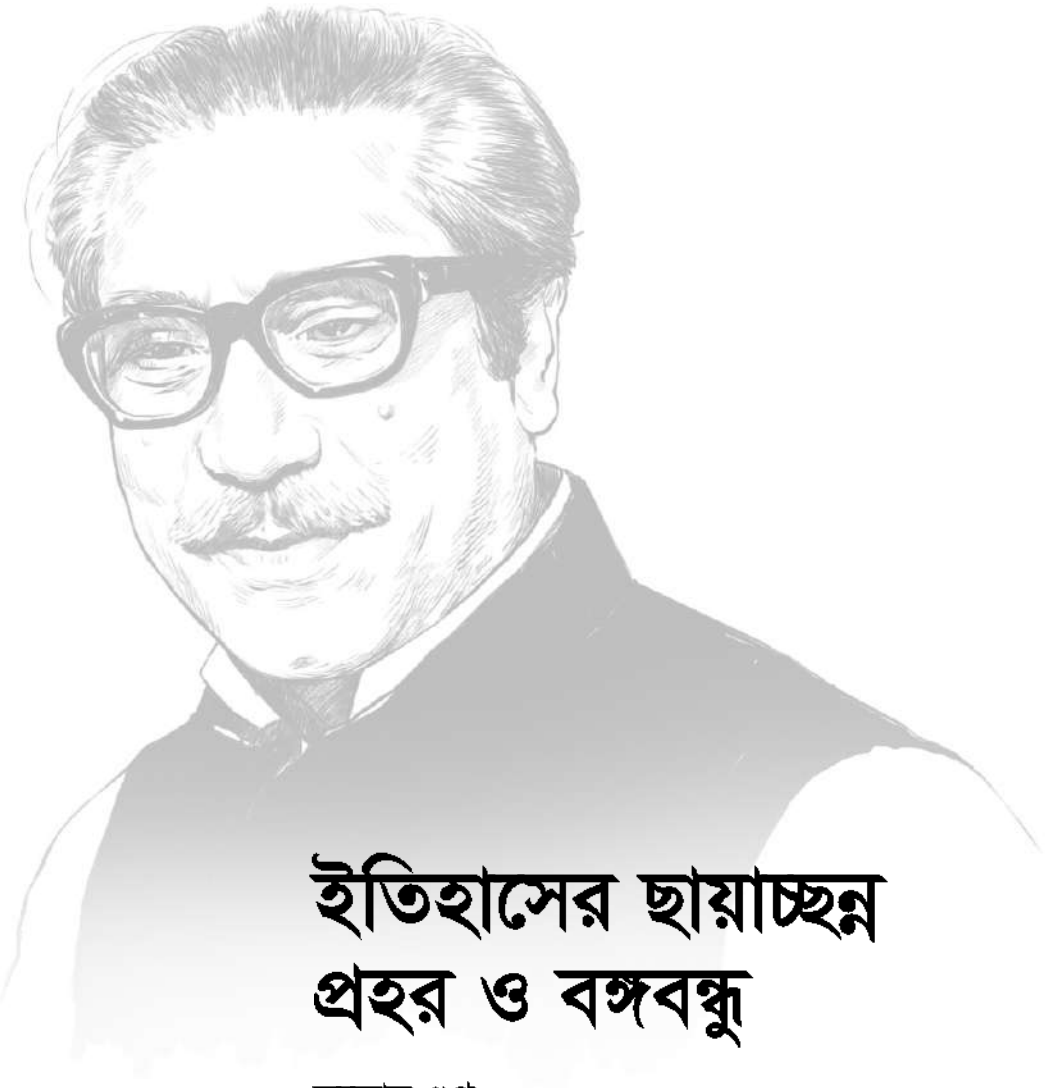

ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন প্রহর ও বঙ্গবন্ধু

সন্তোষ গুপ্ত

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বিপরীত মেরুতে চলে যায়। তখনকার অনেকের আচরণ নিয়ে কথা বলাটা বোধহয় এ মুহূর্তে ঠিক হবে না। প্রেস ক্লাবে সেদিন যদি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ উপস্থিত থাকত, তবে দেখত সাংবাদিকদের মধ্যে যারা আগে বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনাহূতভাবে অশ্রদ্ধেয় কথা বলেছেন। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পাতিনেতা যারা লাইন দিয়েছিল পঁচাত্তরের ৭ জুন বৃষ্টিতে ভিজে, তাদের অনেকেই উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে মুজিব হত্যার খবর শুনে। এসব বিগত দিনের কথা বলে ইতিহাসের মুখ চাপা দিতে কেউ পারবে না। এখানে আমি তাদের কারোর সমালোচনা কিংবা যারা সেই দুর্দিনেও বঙ্গবন্ধুর জন্য সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদেরও বাহবা দিতে বসিনি।

আমার মনে অন্য একটি ঘটনা থেকে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুললাম; বঙ্গবন্ধুর হত্যার ব্যাপারে একজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হত্যাকাণ্ডের

দু-তিনদিন পর। তাঁকে এভাবে প্রাণ দিতে হলো কেন? এমন প্রতিবাদহীন, আলোড়নহীন? আর তাঁর অপরাধ কী এমন গুরুতর যে বিনা প্রতিরোধে যারা হত্যা করেছে তারা পুত্রবধূদ্বয়সহ বেগম মুজিবকে পর্যন্ত হত্যা করল। রাসেলকে কেন মারল? তখন দুঃসময়। আমি রাজনীতির ধারে-কাছে নেই। পৈতৃক প্রাণটা অমূল্য সম্পত্তি। এ সম্পত্তি রক্ষায় সতত যত্নবান। আর কোনো সম্পত্তি নেই বলে বোধহয় এতটা মোহ। আর প্রশ্নগুলো করেছিল বলতে গেলে একহাট লোকের মধ্যে। কোনোরূপ বীরত্বের জন্য খ্যাতি নেই।

আবার তার প্রতিটি শব্দ অন্যে ব্যবহার করলে মনে মনে চটি, কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারি না অভিযোগ। সুতরাং সারা দেশ বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর কেন নিশ্চুপ ছিল, কোথায় গলদ জমা হয়েছিল, তার বিশ্লেষণের শক্তিও ছিল না এবং এজন্য কাউকে ভীতু বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না।

আমি প্রথমে পালটা প্রশ্ন করেছিলাম শেকসপিয়রের বিখ্যাত লাইনটি দিয়ে: When beggars die there are no comet seen: The heavens themselves blaze forth the death of princes. শেখ মুজিবকে এর কোন শ্রেণিতে আপনি ফেলেন? আমরা কি শেকসপিয়রকে সংশোধন করব? বন্ধুটি বিমূঢ়। জনান্তিকে বলা ভালো এ সময়ে আমরা প্রকাশ্যে কাউকে 'বঙ্গবন্ধু' বলতে শুনিনি। আমার এই পালটা প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আমি বললাম তার এই বিমূঢ়তা থেকে উদ্ধারের জন্য যে শেখ মুজিব দুটো অপরাধ করেছেন আর তার প্রথম কারণটায় পরে আসছি। প্রথমত, তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করে পাকিস্তান ভেঙে দিয়েছেন। তাই সব প্রয়াত নেতার জন্মমৃত্যু দিবস এলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, ক্ষমতাসীন সরকার সবাই তাদের আদর্শের গুণগান করেন। অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান দেশবাসীকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকী-জন্মবার্ষিকী তাঁর অনুসারী দল ছাড়া খুব কমই রাজনৈতিক দল স্মরণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির কথাটা উচ্চারণ করাকে পাপ বলে মনে করেন। এই যে মূল্যবোধের মাপকাঠি, তার মধ্যে কাজ করছে পাকিস্তান আদর্শের প্রতি পিছুটান, আর কোথাও Cultural Revolution-এর সংক্রামক ব্যাধি। চীনে আজ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পান্ডাদের বিচার হচ্ছে। নির্যাতন, হত্যা ছাড়াও গ্রন্থ পোড়ানো উৎসব ছিল, লেখক আর নাট্যকারদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। আজ তাদের পুনর্বাসন চলছে। Cultural abortion চীনের ইতিহাসে একটা Cultural Revolution-এ পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ দেশে ধর্মবিশ্বাসের মতো তাঁকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছে। এই বিশ্বাসেই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছে দুই কুকুরের লড়াই হিসেবে। আর আমাদের দেশে বিদেশি কুকুরের প্রতি টানটা বেশি, সুতরাং ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টোগণকে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ভুট্টো এখানে সফরে এলে এদের উল্লাস এবং তার আগমনে 'মণি বাবুদের' বিক্ষোভে এদের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর এই অপরাধ ক্ষমাহীন। আর তার দ্বিতীয় অপরাধ যা তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধুটির প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, তা হলো রাজধর্মে ন্যায়ধর্ম, বন্ধু ধর্ম নেই, শুধু জয় ধর্ম আছে। শেখ মুজিবুর রহমান, ন্যায়ধর্ম আর বন্ধু ধর্মকে সেখানে বড়ো করে দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রাণ দিয়েছেন এক মহত্তম অপরাধের জন্য। সম্প্রতি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দলের কর্মসূচি আর ভাষণ ও বক্তৃতার পাশে নানা অজানা তথ্য বেরিয়ে আসছে। ইতিহাসে সেই তথ্যের যথার্থ বিচার হবে। কিন্তু উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা স্মরণ করে আজ যারা বাহবা দেন, তাদের মধ্যে সেদিন আইয়ুবের এদেশি সহচরদের কেউ কেউ যখন সেই আদর্শের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, তখন হাসি সংবরণ করা কঠিন। বঙ্গবন্ধু ক্ষমা না করে দিলে এদের অনেকের কী হতো ভাবলেও গা শিউরে উঠতে হয়। সেজন্যই আমার ভয় হয় জাতিকে এই অকৃতজ্ঞতার মাশুল বহুদিন দিতে হবে।

"তাঁকে এভাবে প্রাণ দিতে হলো কেন? এমন প্রতিবাদহীন, আলোড়ন-হীন? আর তাঁর অপরাধ কী এমন গুরুতর যে বিনা প্রতিরোধে যারা হত্যা করেছে তারা পুত্রবধূদ্বয়সহ বেগম মুজিবকে পর্যন্ত হত্যা করল। রাসেলকে কেন মারল? তখন দুঃসময়"

এজন্যই যারা জিয়াউর রহমানকে '৭৮-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বলেছিলেন 'সিপাহি জিয়া তোমার গাবতলীর বাড়ি চিনি' তারা দলের উচ্চপদে আসীন হন। হাসিনা-কামালকে লন্ডনে এক্সপোর্ট করার কথা বলা হয়েছিল। বাকশালীদের বাইরে পাঠানোর রাহা খরচ দেওয়ার কথা কেউ রাখেনি।

বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ দেশে তাদের দোসরদের হাতে অসংখ্য লোক নির্যাতনে প্রাণ দিয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। আর কী আশ্চর্য স্বাধীন দেশে পাকিস্তানি দালাল কেউ খুঁজে পান না। শুধু রুশ-ভারতের দালালে দেশটা ভরে গেছে। কারণ '৭১ সালটা 'গোলমালের বছর', স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত লড়াইয়ের বছর নয়। একজন পত্রলেখক জানতে চেয়েছেন–'দেশপ্রেমের ঝুমকো গলায় দিয়ে কথার মল পায়ে পরার রাজনীতি কি আমাদের বিধিলিপি?'

কেউ বললেন, 'খামোশ' দিন আসছে ১৫ দলের ঐক্য, ৭ দলের ঐক্যফ্রন্ট আজ এক। আমিও আশাবাদী। তবে একটা কথা 'সিপাহি জনতা' বিপ্লব বলে কথিত ৭ নভেম্বরের পর জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, তিনি ব্যারাকে ফিরে যাবেন। কিন্তু ব্যারাকে ফেরেননি। ব্যারাকেই রাজনীতি ফিরে আসছে। তবুও আশা আছে।

আমি বিশ্বাস করি একদিন শেখ মুজিবের নাম সরকারি পত্রিকায় আবার ফলাও করে উচ্চারিত হবে। তাঁর ছবির সংখ্যা নিয়ে প্রতিযোগিতায় না নামুক কেউ, পত্রিকার পাতায় তাঁর ছবিও স্থান পাবে। শেখ মুজিব হত্যাকে যদি এ দেশবাসী স্বাগত জানিয়ে থাকে তবে গণতন্ত্রের কোনো রীতিতে তাঁর নাম ফিরে আসবে। যারা স্বাগত জানিয়েছে সেই 'প্রিয় দেশবাসী'র পরবর্তী জেনারেশন তো এটা করবে

না, করবে আজকের দেশবাসী, তা কি রাজনীতিক পণ্ডিতদের পরামর্শ শুনে, না অন্য কোনো কারণে, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একটি সরকারি কাগজের সংবাদে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ না লিখে সেদিন লেখা হয়েছিল 'গুলিস্তানের সামনের রাস্তা'।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য সবাই অনুসরণ করতে, বাস্তবে পরিণত করতে চান। সেখানে শেখ মুজিব নেতৃত্ব না দিলে কি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো? তাহলে আজও কার্পণ্য কেন। যারা গণতন্ত্র চান, দেশবাসীকে শোনান আশার কথা, ভরসার কথা। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জিয়াউর রহমান সবার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হবে, তারা কতটা বাঙালি ছিলেন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করবে আর শেখ মুজিবের বেলায় 'সাক্ষাৎ পুত্র বাপ আটকুড়া' নীতি অনুসরণ, ইতিহাসের কোন বাস্তবতা, মুক্তিযুদ্ধের কোন লক্ষ্য, গণতন্ত্রের কোন মহিমা কীর্তন করবে।

আমি এসব প্রশ্ন করে কাউকে শেখ মুজিবের মতবাদ, কর্মপদ্ধতি কিংবা তাঁর দলের অনুসারী কিংবা আওয়ামী বলুন, বাকশাল বলুন, কোনো দলে কাউকে যোগ দিতে বলছি না। কিংবা, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির সঙ্গে মতভেদ থাকটাই আপত্তিজনক, নিষিদ্ধ বলছি না। গণতন্ত্রের কথাই হলো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু তথ্য অস্বীকৃতি তো গণতন্ত্রপ্রীতির লক্ষণ নয়। কিন্তু ১৫ আগস্টকে বিপ্লব বলে হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতাকে যারা স্বাগত জানিয়েছে, তারা জনগণের দোহাই দেন যখন, তাদের গত সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের এবং '৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা স্মরণ করতে বলি। জনাব কামাল হোসেন ৫৫ লাখ ভোট পেয়েছিলেন ভোট রিগিং হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং দেশবাসীর ওপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র আরোপ তথ্যনিষ্ঠ নয়, এ কথাটা তারা স্মরণ রাখবেন।

তাদের প্রতি কোনোরূপ অসূয়ক মনোভাব পোষণ করে বলছি না। কারণ, দেশের সাধারণ মানুষ আজ অর্থনৈতিক সংকটে দিশেহারা, তাদের বাঁচার পথনির্দেশ করতে রাজনীতিকরাই পারেন। তারা অতীতে ভুল করতে পারেন, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকতে পারে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ষাটের দশকে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এ উক্তি মাথা বাঁধা দেওয়ারই প্রমাণ, অন্ধবিশ্বাসের প্রমাণ–ধর্মে এর স্থান আছে, সেখানে বিশ্বাস প্রধান, তর্ক গৌণ। রাজনীতিতে নয়, আর ১৯৭১ সালে যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে সেই আমেরিকা দীর্ঘদিনের মিত্র বললে স্বীকার করতে হয়, পাকিস্তানি আমল থেকে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কালটা এর মধ্যে গণনায় আনতে হয়।

তারপরও কথা থেকে যায়, রাজনীতিতে উত্তেজনার ক্রমবিকাশ গণতন্ত্র অর্জনের পথ প্রশস্ত করবে না। নিষিদ্ধ পল্লিতে নিহত ব্যক্তির আদর্শ দিয়ে মিছিল, দলত্যাগী ছাত্রনেতা বন্ধুদের হাতে খুন–এসবের মধ্য দিয়ে আমরা ইমদুকেই সৃষ্টি করছি। তরুণদের লোভ দেখিয়ে জনসমর্থন প্রমাণ, আমাদের ভবিষ্যৎকেও বন্ধক দিবে। আজকের দুর্দশা উত্তরণের ব্যর্থতা দুঃখজনক হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎকে যদি হত্যা করা হয় আমাদের যুবকদের, ছাত্রদের এবং দেশবাসী বেকারত্বের অভিশাপগ্রস্ত মানুষকে কোনো কোনো বিশেষ প্রয়োজনে টাকাপয়সা দিয়ে জড়ো করে, তাতে জাতীয় চরিত্র ক্রমাগত সংকটগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ প্রতিপত্তি, অতীতের দুষ্কৃতির জন্য শাস্তির হাত এড়ানোর জন্য নিরাপত্তার জন্য ঘন ঘন দলবদলকে আদর্শ বলে জনমনে প্রচার করার অপকৌশল আজকে গোটা জাতিকে পঙ্গু করবে, আগামী দিনে আমাদের চরিত্রের শবাধারে পেরেক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আর এসবের মূল ইতিহাস বিকৃতির জন্য জাতীয় ইতিহাসে স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে অস্বীকার করে, আত্মগর্বী ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা। এই মানসিকতা যদি হতো তার চেয়ে কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় কিংবা মতবাদগত ভিন্ন আদর্শ (পাকিস্তানি আদর্শ নয়) থেকে উদ্ভূত, তাহলে বলা যেত লোকটা দাম্ভিক, অহমিকাগ্রস্ত। কিন্তু যেখানে শেখ মুজিবের অপরাধকে বিচার করা হয় পাকিস্তান ভাঙার নায়ক হিসেবে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে নয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে পাকিস্তানি রাহুগ্রাস মুক্ত করে জনগণের চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করার দুরূহ কর্মের অগ্রনায়কের ভূমিকা হিসেবে নয়, সেখানে তার হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে একটা অমার্জনীয় অপরাধের নায়ক শেখ মুজিব। কবি জীবনানন্দের ভাষায়, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে চকিতে কি তার মনে পড়েছিল: 'করেছি যে অপরাধ এক ক্ষমাহীন রূপসীর মুখ ভালোবেসে' এজন্যই গণহত্যায়, স্বাধীনতার পর নানাভাবে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যায় কেউ পাকিস্তানি দালাল খুঁজে পান না। পাকিস্তান তো তাদের অগ্রজ। বাংলাদেশে তারা বাংলাদেশি হিসেবে পাকিস্তানের অনুজ। সেক্ষেত্রে সম্পর্কটা ভ্রাতৃপ্রতিম হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। দোহাই আপনাদের নিন্দুকের কথায় কান দিবেন না।

সুতরাং আসুন আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছি সমবেত সুধীমণ্ডলী ও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা ভুল হয়েছে। তার নিন্দা করি। কিন্তু জনগণ হত্যাকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়েছে। এসব কথাবার্তা শুনে আমার মোটা মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

সেই ইদানীংকালের ব্যক্তি মুজিব আর আদর্শ মুজিব নিয়ে বিতর্কের কাহিনি। মুজিব দেশপ্রেমিক, মুজিব সরকার রুশ-ভারতের তাঁবেদার। সেই নশ্বর দেহ আর আত্মার তত্ত্ব আর কী? দূর ছাই! এসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কচকচির দরকার নেই। তার চেয়ে–

'এসো ভাই, তোল হাই
শুয়ে পড়ো চিত।
অনিশ্চিত এ সংসারে
একথা নিশ্চিত–
মুজিব মরেছে দেখো,
দুঃখ কিছু নাই
'সূর্য-সৈনিকদের'
'ঘরে ফেরা চাই'।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা কিংবা পুনরুদ্ধারের কথা উঠেছে। আমরা আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্র, ইন্দোনেশিয়ায় নিয়ন্ত্রিত (guided) গণতন্ত্রের পরিণতি দেখেছি। নেপালের গ্রাসরুট (ঘাসমূল) গণতন্ত্রকে রাজকীয় মহিমায় নির্বাসনে পাঠাতে দেখেছি। বাংলাদেশে '৭৫ সালের ১৫ আগস্টে ঘাতক গণতন্ত্রের চেহারা দেখেছি। তার জের টেনে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে প্রাণ দিতে হয়েছে। লে. জেনারেল এরশাদ এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের কথা বলেছেন। আমার বিশ্বাস, তার বিরোধী ২২ দলের মোর্চাও সেই ব্যবস্থাটার বিরোধী নন। কিন্তু জাতির পিতাকে তাহলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা কোথায়? গণতন্ত্রের সৌধ ২০ তলাই হোক আর ১৫ তলাই হোক, ভিতটা বাদ দিয়ে শূন্যে গণতন্ত্রের ব্যাবিলন উদ্যান নির্মাণ কি সম্ভব! আজকে 'জাতীয় শোক দিবসে' তাকে স্মরণ করার দিনে জানা কথার, প্রমাণিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে কোথাও পৌঁছাতে পারিনি। পারব না। ক্ষমতার মঞ্চ থেকে দয়ার দান হিসেবে কণ্ঠস্বর চৌচির করে 'মুজিব হত্যার বিচার চাই' যে ঈপ্সিত কিছু দিতে পারে না আট বছরে তা প্রমাণিত হয়েছে। হয়তো তাই কোথাও গোপনে এক ধরনের হতাশা, কিংবা উদাসীনতা যাই বলি না কেন মনের কোণে কীটের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে। আর অসহায় নিষ্ফল আক্রোশে বিভেদের কদর্যতা আমাদের দৃষ্টিকে আবিল করেছে।

কিন্তু নাস্তি আরাধনাই সবটুকু নয়। আজও আমরা প্রতিকূল ভাগ্যের হিংস্র বিভীষিকার মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর অবদান সম্পর্কে ক্রমেই গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি, সেখানেই আমরা বঙ্গবন্ধুকে আমাদের আপন সত্তার মধ্যে পাই, সেখানেই নৈরাশ্য-জয়ী প্রহরে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমরা আত্মস্থ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা অনুভব করি।

তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা কবিতার লাইন অজান্তে গুণগুণানি তুলতেই চমকে ভাবি এর অর্থ কী: 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'

একদিন এই বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। সেদিন শ্রীচৈতন্য ধর্মের আবরণে যে সামাজিক ভিত্তিটাকে নাড়া দিয়েছিল, যদিও তা ছিল একটি সীমিত ও সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ; মাত্র একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের সম্পর্ক আত্মস্থ হওয়ার ধারা। কোনো কোনো মনীষী তার ভূমিকা এভাবে দেখেছেন ও বলেছেন যে, শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে তৎকালীন মুসলিম শাসকদের অধীন কর্মচারীর প্রজাপীড়ন থেকে ভীতিগ্রস্ত বাঙালিদের তথা ধর্ম সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুদের পরধর্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে একটা নেতিবাচক প্রতিবাদ রেখেছেন। কাজীর ঘর দুয়ার ভাঙার সংকল্পের মধ্য দিয়ে তার কথায় মুসলিমবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল কি না, তা আজও বিতর্কিত। কিন্তু তারই অজান্তে ওই সময়ের শাসকশ্রেণি মুসলিম বলে নয়, শাসিতদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের বর্ণাশ্রমগত বিভেদ ও বৈষম্য মুসলিম শাসনের মধ্যে স্বীয় সমাজের ভাঙনের ধারাটাকে একালে স্বচ্ছভাবে ধরা পড়লেও বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজে তখন আরও রক্ষণশীল, ন্যায়ের বিধান রচিত হয়েছিল, তখন নির্যাতিত হিন্দুরা যারা একদা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেছিল তাদের দলে দলে মুসলিম হওয়ার সামাজিক ভিত্তি নয়, রাজনৈতিকতাই প্রধান মনে হয়েছিল। তাই এর প্রতিকারের প্রচেষ্টা সঠিক দর্পণে তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু তবু চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার মধ্যে ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হয়। মুসলিম সাহিত্যিকরা প্রথমে এ দেশের সাহিত্যে দেবতার স্থানে মানুষকে আপন হৃদয়ের বেদনায়, কামনায়, আকাঙ্ক্ষার আর্তির আসনে বসান। এ কারণেই শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্তিবাদ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ছায়াপাত এবং মানবিক ধ্যানে তাকে গ্রহণের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বস্তুত বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান এবং ইসলাম ধর্মে মানব সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আবেদনের সুপ্ত শক্তির কল্যাণে প্রকাশ পেয়েছে।

সম্ভবত এই বাংলাদেশেই উভয় ধর্ম ও চিন্তার সাধনার মিলন ক্ষেত্র–তাই বাউল আর বৈষ্ণবী ধারায় পুষ্ট হয়, বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দেয়। সেই বাঙালি চিত্তের বিকাশের ধারাটা বহু পথ অতিক্রম করে, বহু মনীষীর চিত্ত-সম্পদকে মন্থন করে বহির্জীবনে প্লাবনের রূপ ধরে এ দেশের রাজনৈতিক আকাশে। তারই সার্থক রূপকাররূপে ৫০০ বছর পর আবির্ভূত হলেন বঙ্গবন্ধু।

তাই আজ শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে একজন কবি তার কবিতার দুটো পঙ্‌ক্তিতে যে কথা বলতে চেয়েছেন:

বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।

তারই পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ করি বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শনে। সুতরাং তার মৃত্যুবার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবসে' নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বাঙালির যে ভাবমূর্তি দৃশ্যমান, মধ্যযুগ পার হয়ে আরেক ভাবমূর্তির বিশালতা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে তেমনি দীপ্তিমান। শ্রীচৈতন্যের লক্ষ্য ছিল হিন্দুসমাজ, কিন্তু তার দান আজ সব বাঙালির সম্পদ। কারণ হৃদয়ের বেদনা আর আকুতি ধর্মের বাতাবরণের নিচে অস্পষ্ট থাকেনি। সর্বমানবের সেই সম্পদ বাংলাদেশের জাতিসত্তা গঠনের ক্ষেত্রে একটা পলির আস্তরণ ফেলেছিল। চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব পদাবলী-পুঁথি সাহিত্য পর্যন্ত বাউলদের জীবনসাধনায় সমৃদ্ধ সাহিত্যের লোকায়তিক ধারা, তার আত্মার সম্পদ সবকিছু আত্মস্থ করেছেন জীবনের প্রতি পদে, চলার সব বাঁকে একটি লোক–তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যার লক্ষ্য ছিল এ দেশের বঞ্চিত মানুষের মুক্তি। অনেক রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আগে বহুভাবে বহু প্রচেষ্টায় বাংলার এই সাধনাকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। সর্বভারতীয় কাঠামোর মধ্যে অতীতে এই প্রচেষ্টা ধ্যানমূর্তি থেকে বাস্তবে কায়া গ্রহণ করেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতি তাই ক্ষমতা দখলের নয়। বাঙালির সার্বিক মুক্তিজীবনে ও মানসিকতা অর্জন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর রাজনীতিতে ছিল নতুন মূল্যবোধের উদ্বোধন, মানবিক গুণাবলির বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত ছিল তাঁর সংগ্রাম। মনুষ্যত্বের অপমানকে তিনি দূর করার জন্যই সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। আর শোষণের অবসান ছাড়া মানুষের অপমান দূর করা সম্ভব নয়, এই মৌলিক তত্ত্বকে তিনি জীবনে ধারণ করেছেন চারপাশের মানুষের ক্লিষ্ট মুখ দেখে তাদের বুভুক্ষায়, তাদের দারিদ্র্য আর হতাশ্বাসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থেকে। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল আপন সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, বেদনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়ল এই বঞ্চনার সীমানা কোনো ধর্ম বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধনীর বর্বর লোভের এই স্বরূপকে তিনি চিনেছেন জীবনের পাঠশালা থেকে। তাই বাংলাদেশের সব যুগের সব মানুষের যা কিছু অবদান, সংগ্রাম তাকে তিনি আপন বিশালতায় ধারণ করে এই উপমহাদেশে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে, সার্থক নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। তাঁকে এজন্যই যখন বলা হয়

"চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব পদাবলী-পুঁথি সাহিত্য পর্যন্ত বাউলদের জীবনসাধনায় সমৃদ্ধ সাহিত্যের লোকায়তিক ধারা, তার আত্মার সম্পদ সবকিছু আত্মস্থ করেছেন জীবনের প্রতি পদে, চলার সব বাঁকে একটি লোক–তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব"

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তা অতিশয়োক্তি নয়। যে ভক্তিবাদে শ্রীচৈতন্য এ বঙ্গভূমি প্লাবিত করেছে, তার মানবিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মধ্যযুগে এ দেশে যখন এলো মানুষের কথা। তেমনই যে চেতনা বাঙালিকে তার জীবন চর্চায় মুক্তির দিগন্তকে কাছে এনেছে। আপন ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগে তাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে ভাষা আন্দোলনের বৃত্তকে পূর্ণতা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। আমাদের সংগ্রাম, স্বপ্ন, শতাব্দী লালিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে মূর্তরূপ ধারণ করেছে।

তাঁর অবদানের বিশালতার জন্যই একটি শক্তির সংগঠিত কায়া হিসেবে আওয়ামী লীগ সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে জাতীয়তাবাদী চেতনার পথে রূপান্তরিত ও বিকশিত হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর নির্ভীক নেতৃত্ব দলের সীমানা ছাড়িয়ে সব বাঙালির হৃদয়ে আসন নিয়েছেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই বিশাল অবদান, তাঁর নেতৃত্বের এই অতুলনীয় দিকটিকে অনেক সময় আমরা সম্যক মূল্যায়ন অতীতে করতে পারি-নি। তাঁর জীবদ্দশাতেই আমরা তাঁকে শুধু দেখতে চেয়েছি একজন জাতীয় নেতা হিসেবে, একটি দলের সংগ্রামে নেতৃত্ব থেকে উঠে আসা মুক্তিসংগ্রামের নেতা হিসেবেই। কিন্তু তারও উপরে আমাদের আত্মিক মুক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে সম্পর্ক–যেখানে এই অনন্যতা হিংসা-বিদ্বেষ, ধর্মীয় অনুশাসন আর সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে; যে মূঢ়তার শক্তি ধর্মোন্মত্ততা থেকে রসদ আহরণ করেছে, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে আমরা উপলব্ধি করতে চাইনি। মূঢ়তা থেকেও আমাদের মুক্তির নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। এটা অনেকে ধরতে হয়তো পারিনি।

দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান অপেক্ষাও এই নেতৃত্বদান আরও কঠিন, আরও বাধাবিঘ্নসংকুল। ভাষাভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েমের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের আত্মাকে নিষ্কলুষ করতে চেয়েছেন। ঘৃণা, সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি অতীতেও বহুবার একক কণ্ঠস্বর ছিলেন এদেশে। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে অভ্যস্ত চলার পথে দাঁড়িয়ে তিনি কখনো গতানুগতিক মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলেননি। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং একটি প্রগতিশীল সুস্থ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে তিনি ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন অটল বিশ্বাসে।

ব্রিটিশ শাসনামলে বিভেদের শক্তিকে সম্বল করে এ দেশের রাজনীতিতে যে দুষ্টচক্রের আবির্ভাব তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সার্থক নেতা তিনি। তাই প্রতিক্রিয়ার চক্র তাঁকে ক্ষমা করেনি। আজ বেদখল বাড়ির ভিটায় দাঁড়িয়ে এই নির্মম সত্যকে যদি চিনি, তাহলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের জন্য তাঁর আদর্শ অপহরণকারীদের দুয়ারে দাঁড়ানোর অসম্ভবের গান আমাদের আত্মবঞ্চনার মোহে আবিষ্ট রাখতে পারে না।

তাঁকে আমরা চিনিনি বলেই স্বাধীন দেশের বুকে দাঁড়িয়ে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাত এড়ানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অপরাধীদের তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন একান্ত বিশ্বাসে। কিন্তু যে নিজের যুগ ছাড়িয়ে মানবতার ভবিষ্যৎ মানদণ্ডকে রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে গ্রহণ করেছিলেন, সেই 'অপরাধ' তাঁর হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের মৃত্যুকে লক্ষ্য করে বার্নার্ড শ বলেছিলেন, 'পেনালটি অব গ্রেটনেস'। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বার্নার্ড শ এই উক্তি করলেও তা সমভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

বঙ্গবন্ধু রাজধর্ম পালন করতে চাননি। তাঁর কাছে মানুষের ধর্মের চেয়ে বড়ো কিছু ছিল না।

তাই পাঠ্যপুস্তকে তিনি নির্বাসিত। শেখ মুজিব বলে কেউ ছিলেন, যার নামে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিল, একথা কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডেও উচ্চারিত হয় না। তাঁকে স্বীকৃতিদানে কুণ্ঠার অর্থ দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্নতার কবলে ঠেলে দেওয়া। দয়ার দানের ওপর আমাদের স্বাধীনতার রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া। এ কথা যারা জানতে চান না, যারা স্বীকারে কুণ্ঠিত, 'তারা ভালোবাসেননি কখনো'।

লেখক: প্রয়াত সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

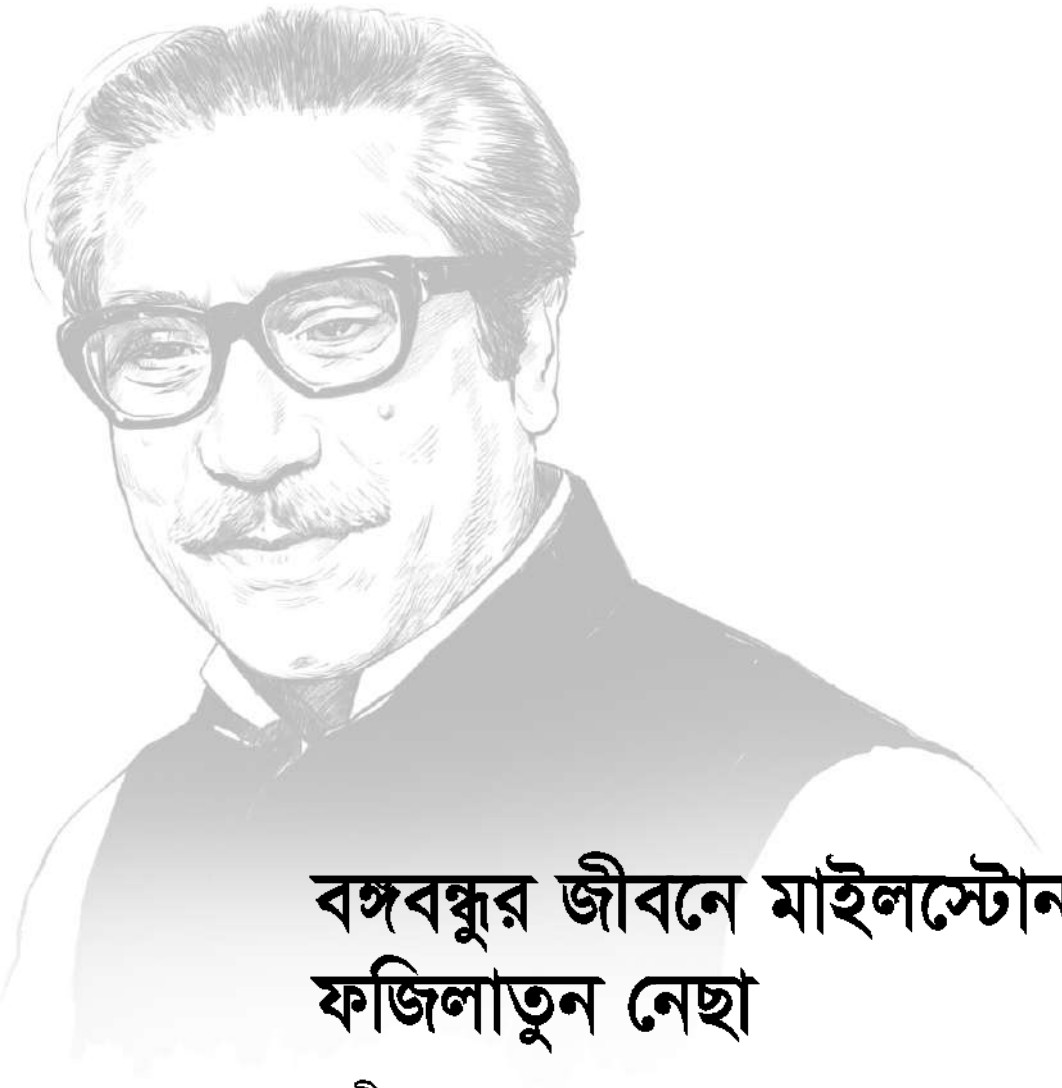

বঙ্গবন্ধুর জীবনে মাইলস্টোন ফজিলাতুন নেছা

বেবী মওদুদ

এক.

একালে রাজনীতি বাঙালির খুব প্রিয় বিষয়। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ভাষণ, বক্তব্য, সাফল্য, ব্যর্থতা ও চিন্তাভাবনা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পছন্দ করি। তর্ক-বিতর্কও করি। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে যারা ক্যারিশমা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, কল্যাণকর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন, লিজেন্ড উপাধি পান, জননন্দিত, দেশনন্দিত ও বিশ্বনন্দিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, কিন্তু এসব রাজনৈতিক নেতার পেছনে তাদের পরিবারের আত্মত্যাগ সম্পর্কে আমরা কতটুকু খবর রাখি বা অনুসন্ধান করি! ইতিহাস কি তাদের খুঁজে বের করবে না?

আবার যাঁরা রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা প্রতিপক্ষের আঘাতে নিহত বা আহত হন, তাদের অবস্থাটা কতখানি অসহায় হয়ে পড়ে, সে খবরই-বা কজন রাখি? এসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবস্থানও তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। বিশেষ করে স্ত্রী যদি অল্পবয়স্ক এবং ছেলেমেয়েরা নাবালক থাকে, তাহলে তো অভাব-অনটনের মধ্য

দিয়েই জীবন কাটাতে হয়, যত দিন-না তারা উপযুক্ত শিক্ষা শেষে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়। অনেক পরিবারই পারে না, ভেসে যায়। কেউ তাদের খোঁজখবরই রাখে না। কিন্তু সময় ও মানসিকতা পালটেছে। আজকাল অবশ্য ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। ক্ষমতার কারণে সন্তানেরাও সমাজে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের চরিত্রের স্খলন ঘটে থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট করে দেয় এসব নষ্ট ছেলেমেয়ে।

এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে আমরা দেখেছি, অভিজাত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে নবাব ও জমিদার পরিবার তো ছিলই, সেই সঙ্গে মাড়োয়ারি, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সন্তানরাও ছিল। এদের অর্থবিত্ত ছিল, পেশিশক্তিও ছিল, প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল। পরবর্তীকালে আইনজ্ঞ ও চিকিৎসকরাও অংশ নিলেন। ইতিহাসে খুব কম রাজনৈতিক নেতার নাম পাওয়া যায়, যারা পরিবার ও সমাজের টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে থাকেন। তাঁদের প্রধান ভিত্তি ছিল জনগণ, তাঁদের একমাত্র উৎস ছিল জনগণ। জনসমর্থন বিপুলভাবে অর্জন করায় তাঁদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের সঙ্গে বেইমানি করতে পারেন না। এঁরাই জনকল্যাণ, সমাজসংস্কারের কথা ভাবতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন স্বভাবজাত কিংবদন্তি, যাঁরা বিপ্লব ও স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে ওঠেন। আব্রাহাম লিংকনের জীবনসংগ্রামের কথা আমরা জানি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তার কথা আমরা শুনেছি। মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগের কথা আমরা শুনেছি। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাদের ভালোবেসেছেন, ভালোবাসাও পেয়েছেন। তাই তাদের অধিকার নিয়ে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের উন্নত জীবনের অধিকারী করতে চেয়েছেন। শেখ মুজিবের বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান আধার ছিল মানুষ, মানুষ এবং মানুষ। এই মানুষের জন্য তাঁর আদর্শ সাহস ও দেশপ্রেম। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তার অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা ও আত্মত্যাগ ইতিহাসের গবেষণায় বিশেষিত হবে। আমি এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনসঙ্গী ফজিলাতুন নেছা রেণুর কথা বলব। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রভাব নিয়ে কথা বলব। আমার মনে হয়েছে, তিনি একজন ঈশ্বরপ্রদত্ত ব্যক্তি (God gifted person) ছিলেন। কবির ভাষায় বলতে পারি,

'রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন রাজারে শাসিছে রানী।
রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে তিনি ছিলেন একটি বাতিঘর এবং মাইলস্টোন। এক, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ, দুই. বঙ্গবন্ধুর বিএ পরীক্ষার সময় কলকাতায় গিয়ে অবস্থান, তিন. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থ সহযোগিতা, চার. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর তিন সন্তানসহ ঢাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস, পাঁচ. ১৯৬৯ সালে ছাত্র-জনতার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্যারোলে মুক্ত হয়ে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যেতে আপত্তি করা, ছয়. ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুকে বলা 'তোমার অন্তর যা চাইছে আজ তাই বলবে। সাত. ৩০ জুলাই ১৯৭৫ সালে দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়া। আট. ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঘাতকের বুলেটে শাহাদত বরণ করে মরণেও সঙ্গী হওয়া।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামের খোকা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, তারপর বঙ্গবন্ধু এবং সবশেষে জাতির পিতা হয়ে ওঠা একটা দীর্ঘ কঙ্করময় পথ। অনেক ত্যাগতিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম-রক্তদান- এক বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আদর্শ ও আত্মবিশ্বাসে অটল ছিলেন বলে দু'বার ফাঁসির মুখোমুখি হয়ে বীরের মতো বিজয়ীর বেশে ইতিহাসের মহানায়ক ও মহামানব এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হতে পেরেছেন। আর এর পেছনে সেই মহীয়সী নারী ফজিলাতুন নেছার কথা আমাদের স্মরণ করতেই হবে। আমি জানি না, কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতাটি কাউকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন কি না। কিন্তু বাঙালি ঘরের মেয়েদের তিনি যেভাবে দেখতে চেয়েছেন, যে প্রতিকৃতি তিনি কবিতার শব্দ ও ছন্দ এঁকেছেন, তাঁদেরই একজন এই মহীয়সী নারী।

দুই.

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেমন ছিলেন, আমরা জানি। তার আদর্শ, স্বপ্ন, দূরদর্শিতা, সাহস, দেশপ্রেম, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ সব আমরা তাঁর প্রতিকৃতি, আচরণ ও স্বভাব এবং কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে খুঁজে পাই। তাঁর জীবনবোধ, পারিবারিক মূল্যবোধের সঙ্গেও আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। জেদ ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানবিকতা ছিল তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য। আর এসব কিছু নিয়েই শারীরিক-মানসিক এবং মননে-মেজাজে বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মুগ্ধাবিষ্ট বিশ্বনেতা। এ থেকেই অনুমান করা যায় তিনি কত বড়ো মাপের নেতা ছিলেন এবং বিরাট হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাদের ভালোবেসেছেন, ভালোবাসাও পেয়েছেন। তাই তাদের অধিকার নিয়ে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন

শেখ মুজিবের জন্ম হয়েছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক নিভৃত অনুন্নত বানভাসি গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়। যে গ্রামটি নদী-নালা-খালঘেরা এবং বিস্তীর্ণ ফসলের প্রান্তর আদিগন্ত বিস্তৃত। যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল নৌকা-লঞ্চ বা স্টিমার। এখানকার মানুষ দরিদ্র, কৃষিজীবী। মানুষ বর্ষায়-বন্যায় ভেসে যাওয়ার ভয়ে বাঁশের টং তৈরি করে বসবাস করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র। তার একটা ঝাপটা এসে লেগেছে দ্রব্যমূল্যে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল। বাংলাও পিছিয়ে নেই। স্বদেশী আন্দোলনে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে ইংরেজ হটাও বিপ্লবে ঘর ছেড়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বিপ্লবীরা। ক্ষুদিরাম

ফাঁসির দড়িতে জীবন দিয়ে লোকশিল্পীদের গানের উৎস। তরুণ সমাজের আদর্শ। এই পরিবেশেই শেখ মুজিব বড়ো হয়ে উঠেছেন। গ্রামের স্কুলে পড়তে পড়তে গোপালগঞ্জ শহরে গিয়ে ভর্তি হলেন। একদিকে গৃহশিক্ষকদের কাছে ধর্ম শিক্ষা; বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস শিক্ষা এবং পাশাপাশি গ্রামীণ প্রকৃতিজাত শিক্ষা। সব বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। সেইসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও মানবিক গুণাবলিও তাকে পরিপুষ্ট করে তোলে, যা তার বড়ো হয়ে ওঠার পেছনে এক বিরাট ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুন। পিতা ছিলেন আদালতের চাকরিজীবী। এছাড়া ক্ষেতের ধানও উৎপন্ন হতো ভালো। মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। বিচক্ষণ পিতা-মাতা থাকায় তাঁর পারিবারিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ ছিল তুলনাহীন।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য আরও এক শুদ্ধময় ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুর জীবনকে সব দিক দিয়ে চিন্তামুক্ত, স্বপ্নময়, আনন্দময় এবং দৃঢ়তায় শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি হলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনসঙ্গী ফজিলাতুন নেছা রেণু। তিনি বঙ্গবন্ধুর চাচাতো বোন ছিলেন। শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হলে বঙ্গবন্ধুর মা তাঁকে পুত্রবধূ করে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তোলেন। গ্রামে জন্ম, গ্রামীণ জীবনধারায পালিত একজন আদর্শ ও মমতাময়ী নারীর প্রতিকৃতি হয়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার ভালোবাসা শ্রদ্ধা আস্থা ছিল গভীর এবং সে কারণেই তিনি নীরবে-নিভৃতে চিন্তাভাবনার অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। পরম প্রিয় ভালোবাসার এই জীবনসঙ্গীকে শেখ মুজিব তাঁর জীবনের সব খুঁটিনাটি কথা শোনাতেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও স্বপ্নের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে প্রস্তুত করে তোলেন। রেণু ছিলেন অসীম ধৈর্য, উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন এক মমতাময়ী স্ত্রী ও জননী। পুত্রবধূ হিসেবে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে এই পাঠ তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অর্জন করতে পেরেছিলেন তাঁর স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা দ্বারা। একজন রাজনৈতিক নেতার বন্ধু ও সহকর্মীদের কথা শুনে থাকি গবেষণা ও তথ্যমাধ্যমে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তান অথবা মাতাপিতার কথা কেউ উল্লেখ করেন না। অথচ তাঁদের স্নেহ-ভালোবাসা, পরিচর্যা, শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধ যে কতখানি আনন্দময় করে তুলে একজন শক্তিমান রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়, সে কথা আমরা খুঁজে দেখি না।

শেখ মুজিব প্রথমে একজন দেশপ্রেমিক ছাত্রনেতা, তারপর নির্ভীক ও আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতা। এরপর হয়ে ওঠেন বাঙালির একচ্ছত্র নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জাতির পিতা এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রনায়ক। এই গড়ে ওঠা, এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা, এই ঐতিহাসিক অর্জন একটা মানুষকে কোথায় নিয়ে তুলেছিল আমরা যদি সেই দিনগুলোয় ফিরে যাই, সেই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এবং একবার চোখ বন্ধ করে ইতিহাসের পাতা খুলে বিবেচনা করি, তাহলে কি কোনো উপলব্ধিতে আসতে পারি?

এই মানুষটিকে জন্ম দিয়েছিলেন যে পিতা-মাতা, তাঁদের স্নেহ-যত্ন ও পরিচর্যা অবশ্যই ছিল, তারপর তাঁর জীবনসঙ্গীর ছিল সতর্ক দৃষ্টি। তিনি তার মিশন ও ভিশনকে হৃদয় দিয়ে ধারণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিজের ভাবনা থেকে আমরা জানতে পারি, 'রেণু খুব কষ্ট করত; কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকাপয়সা জোগাড় করে রাখত, যাতে আমার কষ্ট না হয়।' *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১২৬)*

স্বামীকে তিনি গভীরভাবে জেনেছিলেন বলেই এই অর্থ জোগাড়ের কাজটি নিজের বুদ্ধিমত্তা থেকেই দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময়টায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখার জন্য নিজের অর্থ আলাদা করে পাঠাতেন, তাঁর লেখাপড়ার প্রতিও দৃষ্টি রাখতেন। পিতাও অর্থ পাঠাতেন এবং দৈনিক ইত্তেহাদের সার্কুলেশন বিভাগে কাজ করেও বঙ্গবন্ধু অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু তিনি তো শুধু ছাত্র ছিলেন না, ছাত্র-রাজনীতি ও মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর সেজন্য তাঁর যে অর্থের প্রয়োজন সেটা স্ত্রী রেণু ছাড়া আর কে ভালোভাবে বুঝতে পারবে? কলকাতায় দাঙ্গার সময় ত্রাণের কাজে ব্যস্ত থাকায় পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। পরীক্ষার সময় রেণু কলকাতায় গিয়ে পাশে ছিলেন। এ কথা এ বইয়ে তিনি স্বীকার করেছেন। পিতা তাকে ঢাকায় আইন পড়াতে না চাইলে লন্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে বলেছিলেন এবং প্রয়োজন হলে জমি বিক্রি করে টাকা দিতেও চেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় পিতাকে জানিয়ে দিলেন, 'এখন বিলাত গিয়ে কী হবে, অর্থ উপার্জন করতে আমি পারব না।... আপনি তো আমাদের জন্য জমিজমা যথেষ্ট করেছেন, যদি কিছু না করতে পারি বাড়ি চলে আসব। তবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না।...' *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১২৬)*

> শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার ভালোবাসা শ্রদ্ধা আস্থা ছিল গভীর এবং সে কারণেই তিনি নীরবে-নিভৃতে চিন্তাভাবনার অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। পরম প্রিয় ভালোবাসার এই জীবনসঙ্গীকে শেখ মুজিব তাঁর জীবনের সব খুঁটিনাটি কথা শোনাতেন

বঙ্গবন্ধুর এই জেদ, এই দৃঢ়তা, এই আদর্শবাদিতা আজকের ছাত্রসমাজের কাছে একটি উজ্জীবনী চেতনা। শুদ্ধতম চরিত্র হলে এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা ধারণ করাই সম্ভব। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের সময় বন্দি অবস্থায় অনশনের সময় তিনি যখন প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী, তখন পাকিস্তানি শাসকবর্গ তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্ত হয়ে বাড়ি এলে রেণু কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলেছিলেন, 'তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা-শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড়ো নৌকায়। তিনজন মালা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়ামায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায়

হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাসি-না, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হতো না? মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা?' *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২০৭)*

মাত্র বাইশ বছর বয়সী একজন গ্রামীণ নারীর কী দুঃসাহসী জীবনের কথা ! এত কঠিন সত্য কথা এত স্পষ্ট ভাষায় তিনি ছাড়া আর কে শোনাতে পারেন শেখ মুজিবকে? আর স্বামী শেখ মুজিব এইসব কথা শুনতে শুনতে ভাবছেন, "আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথাটা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, 'উপায় ছিল না'।" *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২০৭)*

আমি কোনো রাজনৈতিক নেতার স্ত্রীর নাম শুনিনি, ভবিষ্যতে শুনব বলেও আশা করি না, যিনি স্বামীর প্রতি এমন হৃদয়দরদি। শেখ মুজিব এই গ্রন্থের এক স্থানে তাঁর স্ত্রীকে ব্যাখ্যায়িত করে লিখেছেন, "আব্বা, মা, ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম। দেখি কিছু টাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুসজল' বোধ হয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। বলল, 'একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এস'।" *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৬১)*

এই 'অমঙ্গল অশ্রুসজল' সারাজীবন তার হৃদয়কে ভিজিয়েছে। তিনি কাউকে জানতে দেননি। স্বামীকে ও সন্তানদের দেখতে ও বুঝতেও দেননি। শেখ মুজিব অবশ্যই এখানে সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, স্ত্রীর কাছে নিজে তো আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং সন্তানদের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে রাজনীতি করেছেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের কারণে কারাজীবন শুরু করলেন। তারপর ১৯৪৯, ১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বারবার গ্রেফতার হয়ে জেলে যান এবং ১৯৬৮ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে প্রধান আসামি হিসেবে ঘোষিত হলেন। তাঁকে সেনাবাহিনীর মেসে বন্দি করে অমানবিক আচরণ করা হয়। প্রথম তিন মাস তো কোনো খবর ছিল না কোথায় আছেন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কী ভয়াবহ ছিল সে দিনগুলো! স্বামী কারাবন্দি, সন্তানদের নিয়ে রেণুর দুঃসহ জীবন এবং স্বামীর মামলার খোঁজখবর করা, অর্থ সংগ্রহ, কারাবন্দি স্বামীকে কারাগারে গিয়ে সাহস দেওয়া, আবার তাঁর দল ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে মনোবল দৃঢ় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা– কী না করেছেন তিনি।

"কারাবন্দি স্বামীকে কারাগারে গিয়ে সাহস দেওয়া, আবার তাঁর দল ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে মনোবল দৃঢ় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা– কী না করেছেন তিনি"

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনায়-অভিজ্ঞতায় রেণুও হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধুর সহায়ক শক্তি যার কাছে তিনি মনের কথা বলে শান্তি পেতেন, সেবা-যত্ন ভালোবাসায় প্রশান্তি পেতেন, পরামর্শ নিয়ে সাহস পেতেন। রেণুর ধীরস্থির, আদর্শময়ী সর্বংসহা প্রতিকৃতিটি দেখে বঙ্গবন্ধু নিশ্চিন্ত মনেই প্রিয় দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন হাসি-মুখে।

তিন.

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে শেখ মুজিব কৃষিমন্ত্রী হলেন। রেণু তার আগেই অবশ্য তিন সন্তানকে নিয়ে ঢাকায় এসে রজনী চৌধুরী লেনে শেখ মুজিবের ভাড়াবাড়িতে উঠলেন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। এটা ছিল তাঁর সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত। স্বামীকে সব সময় কাছে পাবেন এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ ও স্থিতি হবে এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এরপর শেখ মুজিব মন্ত্রী হলে সরকারি বাড়িতে বসবাস, আবার মন্ত্রিত্ব গেলে সেগুনবাগিচায় ভাড়াবাড়িতে বসবাস। বাড়িভাড়া দিতে চাইত না কেউ! স্বামী রাজবন্দি হলে কত অসহায়ত্ব, টানাপড়েন। তবু তিনি ভেঙে পড়েননি। স্বামী আবার মন্ত্রী হলেন, মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে সাধারণ সম্পাদক দায়িত্বে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হলেন।

১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' জারি করে আইয়ুব প্রেসিডেন্ট হলেন, রাজনীতি নিষিদ্ধ হলো। শেখ মুজিব আবার জেলে গেলেন। রেণু সংসার ধরে রাখলেন কঠিন হাতে। স্বামীর মামলা পরিচালনায় নিজের গহনা পর্যন্ত বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই সময়গুলো খুব দ্রুত কেটে যায়। শেখ মুজিব জামিনে মুক্ত হলেও মামলা তার পিছু ছাড়েনি। রাজনীতি থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো, শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তিনি হয়ে উঠলেন একমাত্র এবং একচ্ছত্র নেতা। বাঙালি তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে শুরু করল। ছয় দফা দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন জেনারেল আইয়ুব ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্ক। বাংলার জনপ্রিয় নেতা হিসেবে শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠিত হলেন। অন্যান্য নেতাকে আইয়ুব খান অর্থ, মন্ত্রিত্ব, পারমিট লাইসেন্স ইত্যাদি দিয়ে করায়ত্ত করলেও শেখ মুজিবকে তাঁর নীতি ও আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি। ছয় দফার দাবি ছিল বাঙালির মুক্তিসনদ। পাকিস্তানের শাসন, শোষণ, নির্যাতন, দমন, পীড়ন, বৈষম্য ও বঞ্চনার করালগ্রাস থেকে বাঙালিকে মুক্ত করা, তার স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল বায়ান্নর মাতৃভাষা আন্দোলনের সময়, এবার তার চারাগাছটি সযত্নে মমত্ব দিয়ে লাগিয়ে পরিচর্যায় নামলেন শেখ মুজিব। তাঁর বিরুদ্ধে জেনারেল আইয়ুব, গভর্নর মোনায়েম, তাদের মন্ত্রী ও শাসকবর্গ এবং প্রতিক্রিয়াশীল উচ্ছিষ্টভোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারাও তাদের সঙ্গে ছিল। মওলানা ভাসানীও কি সুবিধা গ্রহণ করেননি? তাহলে তিনি চীনাপন্থী হয়ে আইয়ুবকে সমর্থন করলেন কী করে? মুক্তিযুদ্ধের পর শেখ মুজিব ও ভারতবিরোধী আন্দোলন করে কাদের হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন? জেনারেল জিয়াকে সন্তান বলে আত্মতুষ্টি লাভ করেছিলেন কেন?

শেখ মুজিব ও তাঁর দল একলা চলার সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁদের পেছনে সমর্থন ছিল প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রসমাজের। তারাই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে। নেতৃবৃন্দকে আইয়ুব কারাবন্দি করেছিল। কিন্তু আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাঁদের মুক্তির দাবিতে এবং ছয় দফাসহ ছাত্রসমাজের এগারো দফা দাবির সমর্থনে। শেখ মুজিব তো ছয় দফা ঘোষণা দিয়ে সময় পাননি। জনগণের কাছে তুলে ধরেছেন মাত্র। কিন্তু আইয়ুব শাসনের রক্ষাকর্তারা তাকে সিলেট-ময়মনসিংহ-যশোর-চট্টগ্রাম সর্বত্র তাঁর বক্তৃতার বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছে। তিনি যেখানেই বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেখানেই গ্রেফতার হচ্ছেন। আবার কোর্ট থেকে জামিনও পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তাকে ৮ মে ঢাকার বত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ৭ মে নারায়ণগঞ্জে বক্তৃতা দিয়ে গভীর রাতে ঘরে ফিরে খাওয়াদাওয়া করেছেন, স্ত্রীর কাছে ছেলেমেয়েদের কথা শুনছেন, এই সময়ে একজন এসে জানাল, পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে তাকে গ্রেফতার করতে। এটা তো আর নতুন কিছু নয়। গ্রেফতার হওয়া, কারাজীবন, মামলা চলবে, আবার মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরবেন। কিন্তু এবার যে আইয়ুব আরও কঠোর হবে, সেটা তিনি জানতেন। ছয় দফা যে পাকিস্তানের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সেটাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

> তিনি ঘরসংসার, সন্তান-আত্মীয়স্বজন সামলাচ্ছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন, রাজবন্দি স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অনেক খবর দিচ্ছেন, আবার তাঁর নির্দেশনা শুনে এসে আন্দোলনরত নেতাকর্মীদের জানাচ্ছেন। সভা করার জন্য বত্রিশ নম্বর বাড়িতে সব আয়োজন করে দিচ্ছেন

শেখ মুজিব তো জেলে গেলেন, তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা হলো। আন্দোলনও চলছে বাইরে। ফজিলাতুন নেছা মুজিব তখন পাঁচ সন্তানের জননী, বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর, যথেষ্ট রাজনীতিমনস্ক হয়েছেন স্বামীর ভাবনাচিন্তার সঙ্গী হিসেবে। তিনি ঘরসংসার, সন্তান-আত্মীয়স্বজন সামলাচ্ছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন, রাজবন্দি স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অনেক খবর দিচ্ছেন, আবার তাঁর নির্দেশনা শুনে এসে আন্দোলনরত নেতাকর্মীদের জানাচ্ছেন। সভা করার জন্য বত্রিশ নম্বর বাড়িতে সব আয়োজন করে দিচ্ছেন। আবার বাজারের হিসাব থেকে টাকা সরিয়ে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রতিটি ঘটনা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন বলেই শেখ মুজিবকে বহু আগেই আভাস দিয়েছিলেন যে, জেনারেল তাকে নতুন কোনো মামলায় ফাঁসাতে পারে। আর সেটাই হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এ সময় শেখ মুজিবও চিন্তিত ছিলেন, বেগম মুজিবও জানতেন স্বামীর ভাগ্যে কী ঘটতে পারে।

১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে সেন্ট্রাল জেল থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স মেসে নিয়ে একটি কক্ষে বন্দি করে রাখে, যেখানে কোনো বাতাস ঢোকে না, শুধু একটি বাল্ব জ্বলে এবং সার্বক্ষণিক নজরদারিতে একজন সৈন্য থাকে। প্রথম তিন মাস তো তিনি কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন, বেঁচে আছেন কি না, এসব গুজব ছিল বাতাসে। যখন বেগম মুজিবকে সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলো, তখন জানা গেল তিনি তাদের কাছে বন্দি। তারা নানা প্রশ্ন করেও কোনো সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে তাকে হুমকি দিয়ে যায়, 'প্রয়োজন মনে করলে তাঁকেও গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখবে।' কিন্তু তিনি তো এ হুমকিতে ভীত হওয়ার মানুষ নন। মুজিবের মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবীদের শরণাপন্ন হলেন, আবার ছাত্র আন্দোলনে সহযোগিতা করতে থাকলেন। একদিকে মামলাও শুরু হয়েছে, শেখ মুজিবকে কাঠগড়ায় দেখে জনমনে স্বস্তি এলো, আবার তার পরিবারও সাক্ষাতের সুযোগ পেল। গণ-অভ্যুত্থান যখন তুঙ্গে, গণ-অভ্যুত্থানে যখন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব-মোনায়েমের শাসন অচল হয়ে ভেঙে পড়েছে, আইয়ুবের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, তখন একদল প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতার পরামর্শে আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। সব রাজনৈতিক নেতাকে সেখানে আমন্ত্রণ করা হয় এবং শেখ মুজিব কি যাচ্ছেন? কখন যাবেন, নাকি প্রত্যাখ্যান করবেন, এই নিয়ে তখন জল্পনাকল্পনা ছিল। একদিকে মামলা প্রত্যাহার ও কারাবন্দি রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন, শেখ মুজিব কেমন করে যেতে পারেন?

একদল রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্যারোলে মুক্ত হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পরামর্শ দিতে যাচ্ছেন, এই খবর জানতে পেয়ে বেগম মুজিব তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনাকে দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি না যাওয়া পর্যন্ত যেন শেখ মুজিব কাউকে কোনো কথা না দেন। রাজনৈতিক নেতারা অনেক পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার পরও শেখ মুজিব কোনো উত্তর দিলেন না। তারা সেদিন যাওয়ার সময় শেখ হাসিনাকে বলেছিলেন, 'তুমি কেমন সন্তান যে পিতাকে রাজি হতে দিলে না। তোমার মাকে কি বিধবার বেশে দেখতে চাও?' এ কথায় শেখ হাসিনার উত্তর ছিল, 'আমার মাকে বিধবার বেশে দেখতে পারব; কিন্তু আমার বাবা বাংলার মানুষের সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না।' এখানেও আমরা দেখতে পাই সাহসী কন্যার উপযুক্ত জবাব। এসব আইয়ুবের দালালেরাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাদের সহায়তা করেছিল, সমর্থনও করেছিল।

সেবার বেগম মুজিবের দুঃসাহসী হস্তক্ষেপে বঙ্গবন্ধু শর্ত দিলেন, প্যারোলে যাবেন না। মামলা প্রত্যাহার করে সবাইকে মুক্তি দিতে হবে, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিতে হবে, তারপর তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। তারপর তো ঘটনার দ্রুততায় আইয়ুব শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার বিপুল সংবর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু উপাধি নিয়ে শেখ মুজিব গোলটেবিলে যোগ দিলেন। এরপর আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হয়ে সামরিক শাসন জারি করে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। আর বেগম মুজিব দেখলেন, তাঁর স্বামী দেশ ও মুক্তির সংগ্রামে বীরের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

চার.

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি আরও একবার সাহসী ভূমিকা রাখেন। সেদিন বিকেলে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিবের ভাষণ দেওয়ার কথা। তিনি কি স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন, এ নিয়েও নানা জল্পনা, গুজব, তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছিল। শেখ মুজিবকে নানা জনে নানা কথা বলে পরামর্শ দিয়েছিল। অনেকে চিরকুটে পয়েন্ট লিখে তাঁকে পাঠিয়েছিল।

কিন্তু ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে তাঁর বিশ্রামের সময় বেগম মুজিব একান্তে বসে তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি মনে রেখো, তোমার সামনে আছে জনতা, আর পেছনে বুলেট। তোমার মন যা চাইছে, আজ সে কথাই বলবে।' মাত্র উনিশ মিনিটের এই ভাষণেই শেখ মুজিব বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের কথা উচ্চারণ করে 'রাজনীতির কবি' (Poet of politics) হিসেবে বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা, সর্বাত্মক শত্রুকে মোকাবিলার নির্দেশ পেয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় অর্জন করেছিল। শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে সামরিক আইনে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি প্রদান করে। তাঁর দুই সন্তান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। বত্রিশ নম্বর বাড়ি সিল করে রাখা হয়। বেগম মুজিবকে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে সেনাপ্রহরায় বন্দি করে রাখা হয়। সে এক দুঃসহ জীবনযাপন।

মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে নিজের কবর তৈরি দেখেও শেখ মুজিব একদিন বীরের বেশে জাতির পিতা হিসেবে স্বাধীন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুর মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে বাংলাদেশকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির ডাক দিয়ে সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান জানালেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় একদল ক্ষমতালোভী সেনাসদস্য শেখ মুজিবকে হত্যা করে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে এই হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিষ্ঠা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে মুছে ফেলে। দেশকে এক সন্ত্রাসী জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করে কলঙ্ক লেপন করে।

তারা শেখ মুজিবের স্ত্রী ও সন্তানদেরও হত্যা করে। কী অপরাধ ছিল ফজিলাতুন নেছা রেণুর? তিনি তো প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির স্ত্রী হিসেবে কোনো প্রভাব বিস্তার করেননি? বরং বাঙালি ঘরের একজন আদর্শ নারী হিসেবে স্বামী ও সন্তানদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনিও কি আতঙ্ক ছিলেন ঘাতক শক্তির কাছে? ১০ বছরের শিশু রাসেলের কী অপরাধ ছিল? শেখ মুজিবের তিন ছেলেকে হত্যা করে তারা কী প্রমাণ করতে চেয়েছে? তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা কি পূরণ হয়েছে?

বাংলার মাটি থেকে, বাঙালির হৃদয় থেকে শেখ মুজিবকে তারা মুছে ফেলতে পারেনি। পারেনি বলেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা হিসেবে, বাংলার মানুষের ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয়ে রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর বিদেশ যাওয়াটা ছিল ভাগ্যের লিখন, তেমন বাঙালি জাতির একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসেবে পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করাও তার একমাত্র লক্ষ্য। বাংলাদেশ আজ পেছনে পড়ে নেই। শিক্ষা, প্রযুক্তি, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে আলোকিত পথে এগিয়ে চলেছে। তাঁকে যারা পেছনে টানতে চাইবে, তারা বাংলার শত্রু। বাঙালির শত্রু। তাদের প্রতিরোধ-প্রতিহত করার সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে তরুণ প্রজন্মকে।

লেখক: প্রয়াত সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

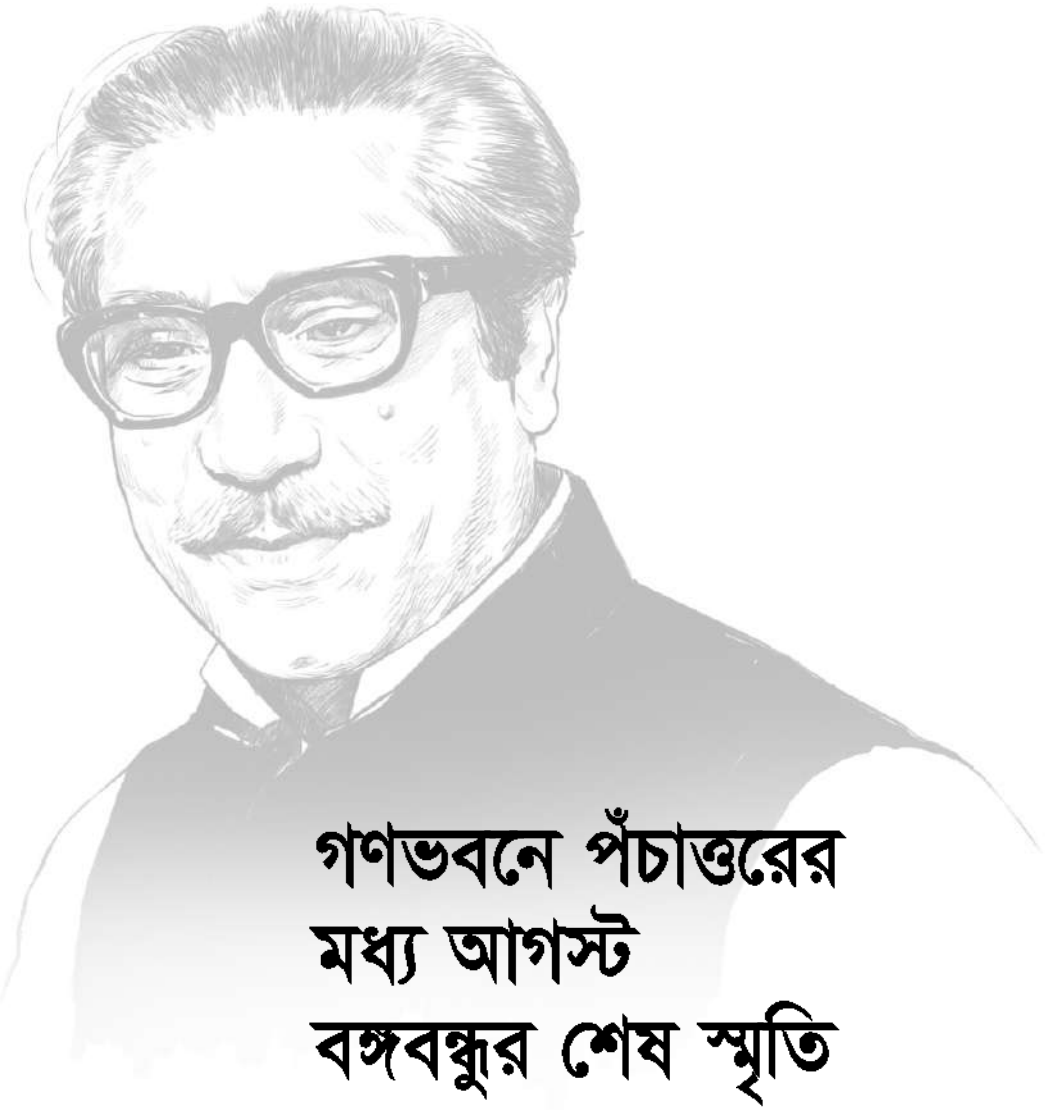

গণভবনে পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শেষ স্মৃতি

মাহবুব তালুকদার

আমার লেখা 'বঙ্গভবনে পাঁচ বছর' বইয়ে উনিশ শ পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের দিনের ঘটনাবলি তাতে স্থান পেয়েছে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে গণভবনে জাতির পিতার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাতের মুহূর্তগুলো স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। উল্লিখিত গ্রন্থে আমি যা দেখেছি তাই লিখেছি। কিন্তু গণভবনকে কেন্দ্র করে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, যা তখন ডায়েরিতে লেখা হয়নি। সেসব অনুল্লিখিত তথ্য ও প্রকাশিত কিছু তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে আজকের এই রচনা।

উনিশ শ পঁচাত্তরের পঁচিশে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি রাষ্ট্রপতির জনসংযোগ অফিসারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস সচিবের পদে নিযুক্ত হই। আমি তৎকালে সরকারের উপসচিব থাকায় পরিবর্তিত পদবিটি উপপ্রেস সচিব না হয়ে সহকারী প্রেস সচিব হওয়ায় প্রথমে কিছুটা ম্রিয়মাণ ছিলাম। কিন্তু জাতির পিতার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার জন্য পরম

গৌরবের বিষয় ছিল। ফলে ওইসব নেতিবাচক অনুভূতি মন থেকে উবে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি দেশের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছি এবং ইতিহাস রচনার প্রতিটি মুহূর্তকে স্পর্শ করার সুযোগ লাভ করেছি।

পঁচাত্তরের চৌদ্দই আগস্ট দিনটি শুরু হয়েছিল অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতোই। কিন্তু সন্ধ্যার পরের ঘটনাবলি মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। সেদিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু ডেকেছিলেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব তোয়াব খান ও আমাকে। পরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ভাষণ দেবেন তার খসড়া তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিলাম, তিনি কি তাহলে লিখিত ভাষণ দেবেন? তোয়াব খান কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে। তিনি বললেন, লেখা বক্তৃতা পড়ব না, মুখেই বলব। তবে হাতের কাছে লেখা সমস্ত ডেটা ও ইনফরমেশন থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু গণভবনস্থ কার্যালয় থেকে মাঝে মাঝে দুপুরে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের বাসায় যেতেন। আবার কখনো গণভবনেই দোতলার একটি কক্ষে বিশ্রাম নিতেন। ১৪ আগস্ট দুপুরে তিনি গণভবনে ছিলেন না বাসায় গিয়েছিলেন, তা মনে নেই। আমার ডায়েরিতেও এ বিষয়ে কিছু লেখা নেই। তবে ওইদিন দুপুরবেলা আমি তাঁর আত্মজীবনীর ডিকটেশন নেওয়ার সুযোগ পাইনি। তিনি সময় দিতে পারবেন না জানিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর প্রথম অনুলেখক ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও তোয়াব খান। তাঁরা উভয়ে বঙ্গবন্ধুর বাল্যকাল থেকে উনিশ শ চুয়ান্নর নির্বাচন পর্যন্ত আত্মজীবনীর ডিকটেশন নিয়েছিলেন। এটি টাইপকৃত বাঁধাই অবস্থায় আমার কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর পরবর্তীকালের আত্মজীবনী অনুলিখনের কাজ করছিলাম আমি। এসব কাগজপত্র আমার ব্রিফকেসে থাকত। চৌদ্দই আগস্ট ব্রিফকেস থেকে নামিয়ে আমার অফিসের ড্রয়ারে আমি তা তালাবদ্ধ করে রাখি। ইচ্ছা ছিল পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের পর গণভবনে ফিরে আমি আত্মজীবনীর ভাষাগত পরিশুদ্ধির কাজ করব। কিন্তু তার আগেই ইতিহাসের নির্মমতম ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গেল। ১৬ আগস্ট নিজের প্রাণ বাজি রেখে পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করার জন্য আমি গণভবনে যাই। কিন্তু জনৈক মেজর ও অন্যান্য সামরিক ব্যক্তির ব্যূহ ভেদ করে আত্মজীবনীটি আমার টেবিলের তালাবদ্ধ ড্রয়ার থেকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। প্রাণের ভয় নয়, আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি বিনষ্ট করার ভয়ে মেজরের সামনে ড্রয়ার খুলতে পারিনি। চিরদিনের মতোই জাতির এই অমূল্য সম্পদ আমি হারিয়ে ফেলি। আজও সেদিনের ব্যর্থতার গ্লানি আমাকে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। আমি জানি শত মাথা খুঁড়লেও মানুষটিকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেলে আমার শোকের সন্তাপ কিছুটা কমত।

উনিশ শ পঁচাত্তরের চৌদ্দই আগস্ট দিনটি অন্যান্য দিনের মতো গতানুগতিক হলেও বিকাল থেকে দিনটি ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে। অনেক সময় বিকালবেলা বঙ্গবন্ধু গণভবনের লেকে মাছগুলোকে আধার খাওয়াতেন। লেকের সিঁড়িতে তাঁর দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়লেই মাছের ঝাঁক ছুটে আসত খাবারের জন্য। আমাদের কয়েকজন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও অনেক অভ্যাগত এই দুর্লভ দৃশ্য দেখেছেন। চৌদ্দই আগস্ট বিকালে এহেন দৃশ্য দেখা যায়নি। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসকক্ষে ব্যস্ত ছিলেন। পরের দিন বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য চারটি স্বর্ণপদক প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন তিনি। কিছু ফেলোশিপ প্রদানের কথাও ভেবেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী, শিক্ষা সচিব এম মোকাম্মেল হকের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিগত কয়েকদিন আলাপ-আলোচনা করেছেন তিনি।

বিকালবেলা শিক্ষা সচিব আসবেন গণভবনে। তাঁর কাছ থেকে তথ্যাদি নিয়ে বক্তৃতার একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রেস সচিব তোয়াব খান। নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা সচিবের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। তিনি যথাসময়ে আসছেন না দেখে আমার উদ্বেগ বাড়ল। আগেভাগে তথ্যাদি না পেলে বক্তৃতার খসড়া তৈরি হবে কী করে। ইতোমধ্যে প্রেস সচিব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় জড়িয়ে গেলেন। দুঃসংবাদ এলো ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রামগতিতে ক্রাশ করেছে। তাতে কয়েকজন ভারতীয় সামরিক অফিসার নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মতদ্বৈততা দেখা দিল। ভারতের রাষ্টদূত সমর সেন তখন দিল্লিতে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত বললেন, হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া ঠিক হবে না। তোয়াব খান বললেন, এ বিষয়টি আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত জানানো হবে। বিষয়টি নিয়ে প্রেস সচিব অত্যন্ত পেরেশানিতে পড়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু তার আগেই গণভবন থেকে বাসায় চলে গেছেন। চৌদ্দই আগস্ট সন্ধ্যার পরে বঙ্গবন্ধু যখন বাসায় রওয়ানা হন, আমি তখন গাড়ি-বারান্দায় তাঁকে বিদায় জানিয়েছি। আজ এত বছর পরেও সেই বিদায় দৃশ্যটি স্মৃতিতে জাগরূক হলে আমার বুকের ভেতর শিহরণ বয়ে যায়। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে গণভবন থেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁর গাড়ির দরজা আমি বন্ধ করেছিলাম, এই গৌরব বেদনা মেশানো অনুভূতি আমাকে আজও ভাববিহ্বল ও অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

সেদিন রাতে রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব মসিউর রহমান, ফরাস উদ্দীন ও যুগ্ম সচিব মনোয়ারুল ইসলামের বিদেশ গমন উপলক্ষ্যে গণভবনে ফেয়ারওয়েল ডিনার ছিল। বিদায়লগ্নে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম,

> পঁচাত্তরের চৌদ্দই আগস্ট দিনটি শুরু হয়েছিল অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতোই। কিন্তু সন্ধ্যার পরের ঘটনাবলি মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। সেদিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু ডেকেছিলেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব তোয়াব খান ও আমাকে

আজ গণভবনে মসিউর রহমান, ফরাসউদ্দীন ও মনোয়ার সাহেবের ফেয়ারওয়েল ডিনার।

'হ, জানি–বঙ্গবন্ধু বললেন, তার মানে আমারে অহনই ছুটি দিলা তোমরা।' মৃদু হেসে আরও বললেন, 'ফরাসের ডিনারে তো আমি থাকতে পারি না।'

বঙ্গবন্ধু বাসায় চলে যাওয়ার পর পর শিক্ষা সচিবের ফোন এলো। জানালেন অসুস্থতার জন্য তিনি গণভবনে আসতে পারছেন না। টেলিফোনে তিনি শিক্ষা খাতের ব্যয় ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কতিপয় তথ্য লিখে নিতে বললেন।

টেলিফোনে ডিকটেশন নিতে নিতে আমার উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হলো।

তোয়াব খান রামগতির ঘটনা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। পরে তাঁর মনে হলো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আসা প্রয়োজন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বাসায় ফোন করলে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুমি আমার অফিসে গিয়ে রেড টেলিফোনে আমারে ফোন করো।' প্রেস সচিব বঙ্গবন্ধুর অফিসকক্ষে গিয়ে তাঁর নির্দেশ নিয়ে ফিরে এলেন। তাদের কী কথা হয়েছে, আমি জানি না। কিছুক্ষণের মধ্যে ভারতীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের ফোন এলো। প্রেস সচিব জানালেন, দুর্ঘটনার খবরটা প্রচার করা উচিত হবে। নইলে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। ভারতীয় কূটনীতিক বললেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে দিল্লির সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রেস সচিব জানালেন আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমতাবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। প্রেস সচিব যখন বঙ্গবন্ধুর কক্ষে কথা বলতে গেছেন, ঠিক তখনই তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুর টেলিফোন করলেন। রাত তখন ৯টার কাছাকাছি। আমি টেলিফোন ধরলে তিনি বললেন, এত রাতে কী করছ ওখানে?

বললাম, অফিসের কাজ করছি। আগামীকাল বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। তাঁর বক্তৃতা তৈরি করছি। তোয়াব সাহেব কোথায়? তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন তাঁর অফিসের ফোনে। আমি কি তাঁকে কোনো মেসেজ দেব?

না, দরকার নেই। তাহের উদ্দীন ঠাকুর ফোন ছেড়ে দিলেন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। চৌদ্দই আগস্টের রাতে গুলশানে আরেকটি নৈশভোজের আয়োজন হয়েছিল। ওই নৈশভোজে যোগদান করেছিলেন তাহের উদ্দীন ঠাকুর, রাষ্ট্রপতির সচিব আব্দুর রহিম এবং অন্যতম সচিব ডক্টর এম এ সাত্তার। উভয় সচিব গণভবনের ডিনারে আমন্ত্রিত হলেও সে রাতে তাঁরা গুলশানে গিয়েছিলেন। প্রেস সচিবকে অবশ্য গুলশানে যেতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমার ধারণা, তাঁরা সবাই মাহবুব আলম চাষীর গুলশানস্থ বাসভবনে আমন্ত্রণে শামিল ছিলেন। রাষ্ট্রপতির দুজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা সচিবদ্বয়কে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার উদ্দেশ্যেই যে ওই কালরাত্রিতে গুলশানে আরও একটি নৈশভোজের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রেস সচিব তাঁর অফিসে প্রত্যাবর্তনের পর আমি নিজের অফিসকক্ষে এলাম। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তথ্যগুলো সাজাতে গলদঘর্ম হলাম। ইতোমধ্যে ডিএফআইয়ের নবনিযুক্ত চিফ কর্নেল জামিল এলেন আমার কক্ষে। ঈষৎ ভর্ৎসনা করে বললেন, আমরা সবাই ডিনার টেবিলে বসে আছি। আপনার আর তোয়াব সাহেবের অফিসের কাজ শেষ হয় না। ব্যাপারটা কী?

কর্নেল জামিলের সঙ্গে আমার পরিচয়, আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা নতুন বলা চলে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে ওঠে। আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী কর্নেল জামিলের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও ছিল। তিনি তাঁর সামরিক জীবনের অনেক গল্প করতেন আমার কাছে। আমিও আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিভিন্ন ঘটনা শোনাতাম তাঁকে। তাঁর তাগিদ পেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং তোয়াব খানকে সঙ্গে করে ডিনারে যোগ দিতে এলাম। ডিনার টেবিলে আমি ও কর্নেল জামিল পাশাপাশি বসেছিলাম। আবার পুরোনো দিনের গল্প জমে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। তখন কি জানতাম মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কর্নেল জামিলকে শাহাদতবরণ করতে হবে? চিরদিনের জন্য আমরা তাঁকে হারাব! শত্রুকবলিত বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কর্নেল জামিল। জাতির পিতার জন্য আত্মাহুতি দিয়ে কর্নেল জামিল শহিদের শিরোপা লাভ করলেন। চৌদ্দই আগস্ট রাত ১১টার পর আমি কর্মস্থল গণভবন থেকে আমার বাসস্থান বঙ্গভবনে রওয়ানা হই। ফার্মগেট পেরিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরে যেতে আমার গাড়ির সামনে দুটি গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে কয়েকজন বিদেশিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দিকে যেতে দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিলাম। সম্ভবত তাঁরা কোনো রকম সংকেত পেয়ে আশ্রয় লাভের জন্য অত রাতে হোটেলে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে এসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মধ্যরাতে বাসায় ফিরেও আমার অনেক কাজ করার বাকি ছিল। বঙ্গবন্ধুর একটি নিজস্ব টেপ রেকর্ডার আছে, সেটি আমার কাছে থাকে। তিনি কোথাও বক্তৃতা দিলে সভা থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেপ বাজিয়ে শোনাই। কোনো জায়গার কোনো অংশ বাদ দিতে হলে তিনি বলে দেন। আমরা সম্পাদিত অংশটুকু প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিই। প্রতিবারের মতো সে রাতেও টেপ রেকর্ডারটি চেক করলাম। দুপুরে কেনা নতুন ব্যাটারিগুলো ভরে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেখলাম, সব ঠিক আছে।

রাতে আবার বসলাম বক্তৃতার খসড়া নিয়ে। কয়েকটা পাতা কাটাকাটি হয়েছিল। ওই অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া যায় না। ওগুলো ভালো করে আবার কপি করলাম। রাত প্রায় দেড়টায় আমার কাজ শেষ হলো। পর দিন ভোরে ওঠার তাড়া আছে। সকালবেলাই বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে।

পনেরোই আগস্ট প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল এক দুঃস্বপ্ন চোখে নিয়ে। দূরে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। এর মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল। আমার এক আত্মীয় ফোনে জানালেন, কারা যেন বলছে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হলো তাঁর কথা। রেডিয়ো অন করে নিজের কানে সেই ভয়াবহ কথাগুলো শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। প্রথমে মনে হলো কেউ ঠাট্টা করছে। কিন্তু রেডিয়োতে কে ঠাট্টা করবে? কেন করবে? তাহলে যা বলা হচ্ছে, তাই কি সত্যি?

আমি বঙ্গবন্ধুর টেপ রেকর্ডারটা হাতে তুলে নিলাম। ওটা বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাভেজা কণ্ঠে বললাম, এ হতে পারে না। হতে পারে না।

পুনশ্চ, আজ বঙ্গবন্ধু হত্যার একুশ বছর পরে শোকাচ্ছন্ন মনে তাকিয়ে আছি তাঁর একটি ছবির দিকে। মৃত্যুর পঁচিশ ঘণ্টা পূর্বে বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর ফটোগ্রাফে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন, লিখেছিলেন শেখ মুজিব ১১/৮/৭৫। সম্ভবত এটিই তাঁর অটোগ্রাফকৃত শেষ ছবি।

আর একটি কথা। বঙ্গবন্ধুর সেই ব্যক্তিগত টেপ রেকর্ডারটি আমি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হওয়ার পর আমাকে ফেরত দিতে হয়েছিল। কিন্তু পুরোনো ক্যাসেট ফেরত না দিয়ে নতুন ক্যাসেট কিনে সরকারিভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। পুরোনো ক্যাসেটগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ তিনটি বক্তৃতা রেকর্ড করা আছে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ। উদাত্ত কণ্ঠস্বর আগের মতোই বাজে। স্পুলের ক্যাসেট আজও বিকৃত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি কখনো বিকৃত হয় না।

লেখক: নির্বাচন কমিশনার

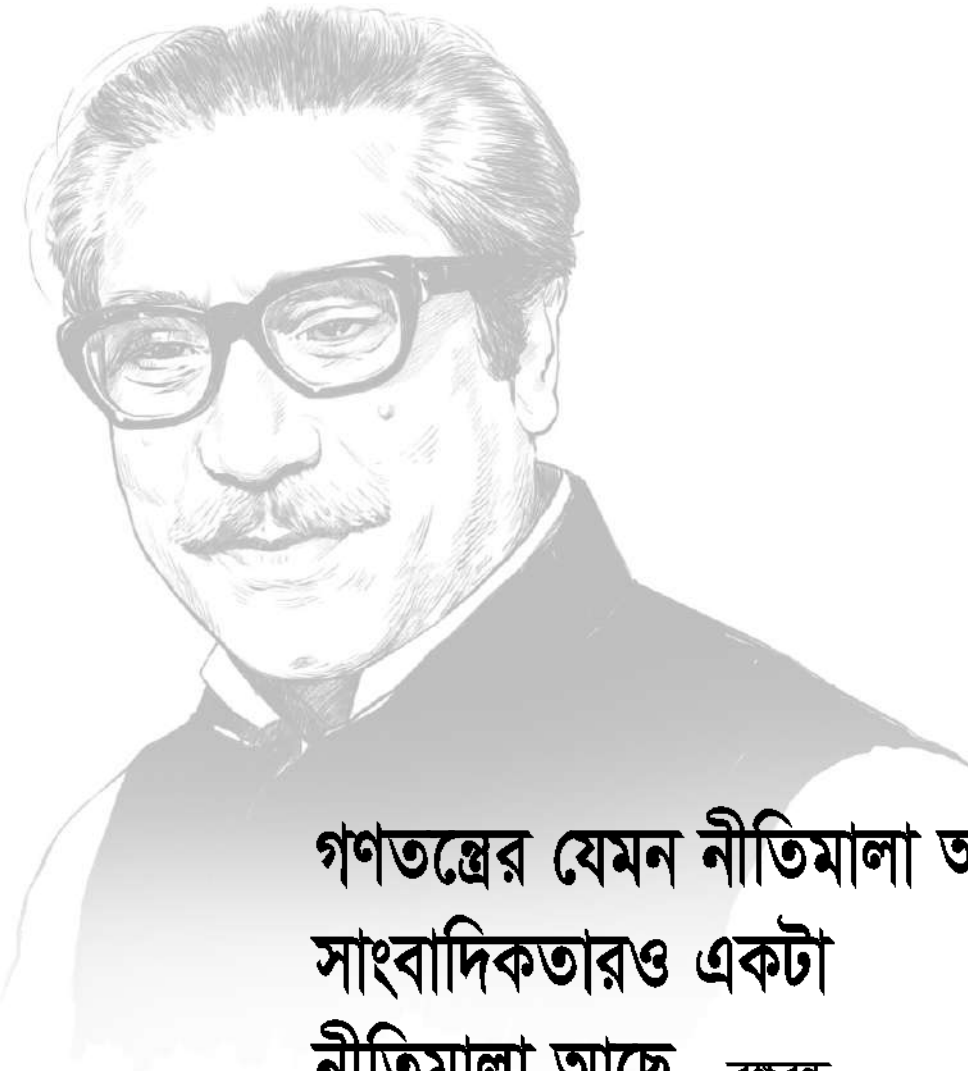

গণতন্ত্রের যেমন নীতিমালা আছে, সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে –বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকতা করেছেন। এটা ছিল তাঁর বর্ণময় জীবনের অনন্য একটা দিক। যা গণমাধ্যমের ইতিহাসেও গৌরবদীপ্ত। বঙ্গবন্ধুর গণমাধ্যমপ্রেম তথা উজ্জ্বল সাংবাদিক জীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী ইত্তেহাদ, মিল্লাত, ইত্তেফাক, নতুন দিন, স্বদেশ পত্রিকা। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জন বা সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নানাভাবে পত্রিকা প্রকাশ এবং সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। কখনো মালিক, কখনো সাংবাদিক, কখনো প্রতিনিধি, কখনো পরিবেশক, কখনো উৎসাহদাতা, কখনো প্রেরণা-আদর্শের অভিভাবক। তাই বঙ্গবন্ধুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-আবেগ সাংবাদিকদের। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাংবাদিকদের ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের কল্যাণে নিয়েছিলেন বিশেষ উদ্যোগ। আইনও প্রণয়ন করেছিলেন। এক কথায় সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও বঙ্গবন্ধু যেন এক সূত্রে গাথা।

১৬ জুলাই ১৯৭২, ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে একটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। পাঠক-গবেষকদের জন্য প্রদত্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরেছেন- নিরীক্ষা'র সহকারী সম্পাদক– **দুলাল আচার্য**

মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ ও সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধুও ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্য করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই। তেমনি নাই ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য। তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলেই তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।

স্বাধীনতার পটভূমি

সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোনো দেশ কোনো যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজে কখনো কোনো রকম হস্তক্ষেপ করি নাই। যদিও নতুন বাংলাদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। বিপ্লবের পূর্বেকার সরকার একটা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মতো ছিল। আর যারা এদেশে ছিলেন, জাতীয় সরকার কী করে চালাতে হয়, সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের তাই নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। শুধু মুক্তিবাহিনীর ভায়েরাই অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে নাই। জনগণকেও লড়তে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। হানাদার বাহিনী যাওয়ার সময় আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর দলিল আছে। শত্রুদের বিচারের সময় আপনারা সেসব দলিল দেখতে পাবেন।

> হানাদার বাহিনী যাওয়ার সময় আমাদের স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর দলিল আছে। শত্রুদের বিচারের সময় আপনারা সেসব দলিল দেখতে পাবেন

সাংবাদিকতার আদর্শ

আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতাসংগ্রাম করেছি, এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রেরও একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনি একটা নীতিমালা আছে। আমরা জানি, সাংবাদিকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যারা সামরিক চক্রের হীন কাজে সহায়তা করেছেন। তারাই ধরিয়ে দিয়েছেন সেইসব সাংবাদিকদের, যারা আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। এই তথাকথিত সাংবাদিকদের একজন কোনো দৈনিক কাগজে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি আলবদরের সেকেন্ড ইন-কমান্ড ছিলেন। এমন সাংবাদিকও আছেন, যাদের এই ধৃষ্টতামূলক কাজের নজির আমাদের কাছে আছে। তারা হানাদার বাহিনীকে সংবাদ সরবরাহ করতেন। কিছু কিছু সাংবাদিক নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করতেন। কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে খাবার সরবরাহ করেছেন। আপনারা কি বলবেন যে, তাদের গায়ে হাত দিলে গণতন্ত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত করা হবে?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

যিনি একদিন দৈনিক 'পয়গাম' চালাতেন, তিনি যদি আয়-উপার্জনহীন কোনো ব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেন, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তার এই মালিকের টাকা কোত্থেকে এলো? এরপর আবার এই রাতারাতি গজিয়ে ওঠা মালিক-সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনোদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোনো সংস্থা যদি এখান থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন, না সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বার্থ, যে ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে আর কখনো ছিল না। এই জন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ ছাপানো হয়, 'এক লক্ষ বামপন্থী হত্যা', 'বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ' ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এবং এসব কার স্বার্থে ছাপানো হয়?

সংবাদপত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোনো

কোনো খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা সাম্প্রদায়িকতার চরম। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চব্বিশটি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকরা সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন তাহলে আপনারা কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একখানা কাগজে লেখা হয়েছে 'গণহত্যা চলছে'। গণহত্যার কথাই যদি বলে, তবে আমি আপনাদের বলব যে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বহু আওয়ামী লীগ কর্মী আর প্রগতিশীল কর্মী মারা গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে গণহত্যা হয় নাই। এজন্যে দুনিয়ার কাছে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এত বড়ো বিপ্লবের পরে, হানাদারদের দ্বারা সংঘটিত এত বড়ো হত্যাকাণ্ডের পরেও যে আর একটা হত্যাকাণ্ড হয় নাই, তার জন্য বাংলার মানুষ ও প্রগতিশীল কর্মীদের আপনারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ, জানাবেন।

ভারতীয় চক্রান্ত?

অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা বলে থাকেন। যারা আমাদের দুর্দিনে সাহায্য করেছে তারা নাকি আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পকেটে ফেলে রাখবার চেষ্টা করছে। এ ধরনের কথা বলা কি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা? এর নাম কি গণতন্ত্র?

যদি কেউ অনাহারে মরে থাকে, আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। তার জন্য আমিও দায়ী হব। আমি চেষ্টা করছি, যাতে কেউ অনাহারে না মরে। যদিও দেশে খাবার নাই। আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন। আমি বিদেশ থেকে ১৭ লক্ষ টন এনেছি। ভারত ৭.৫ লক্ষ টন খাবার দিয়েছে। এছাড়া 'আনরড' এবং ইউএসএ, কানাডা ও রাশিয়া থেকেও খাবার পাওয়া গেছে। সাধ্যমতো সবাই আমাদের সাহায্য করছে। এর ভিতর ভারতীয় চক্রান্ত কোথায়? অথচ কোনো কোনো খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে: '৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার', 'আমরা কি সত্যিই সার্বভৌম' ইত্যাদি।

দালাল সাংবাদিক

অনেক কাগজের শিরোনাম আমার কাছে আছে। এই কাগজগুলো ফরমান আলী খানের দয়ায় ঢাকায় বসে নয় মাস কাজ করেছে; কিন্তু তাদের আজও ছোঁয়া হয় নাই। অনেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিক মা-বোন-বউ ঘরে ফেলে অকূল পাথারে ভেসে বেড়িয়েছেন। কিন্তু ফরমান আলীর অনুগ্রহভাজনরা এখানে বসে আরামে খবরের কাগজ চালান এবং হানাদারদের সাথে সহযোগিতা করেন। এরপর স্বাধীনতা পেয়ে তারা রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে গেলেন। তারা এখন সরকারের বিরুদ্ধে লেখেন। তাদের সরকার ক্ষমা করতে পারে, জনগণ ক্ষমা করবে কি না সন্দেহ আছে।

সরকারের যেমন স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আছে, তেমনি নীতি পালনের দায়িত্ব আছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও আছে।

আমরা গণতন্ত্র চাই; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা চাই না, কারও বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও চাই না। অথচ কোনো কাগজে লেখা হয়েছে: 'মুসলমানকে রক্ষা করার জন্য সংবদ্ধ হও'। যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তাহলে তা কি আপনারা সহ্য করবেন? আপনাদের যে কোনো কথা বলার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আপনাদের একটা নীতিমালাও রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের সংকট

স্বাধীন দেশে যথেচ্ছাচার চলতে দেওয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তারই আছে, যে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করতে জানে। আপনাদের অনেক দাবি ছিল, সেসব দাবি আমরা সব সময়ই সমর্থন করেছি। আর গত ছয় মাসে কোনো দাবিই পূরণ করা হয় নাই, এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না। স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের হাতে কী ছিল? তখন আমাদের পোর্ট বন্ধ। আমাদের রাস্তা নাই। গুদামে চাল নাই। এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রা নাই। রাজস্ব আদায় নাই।

তবু সরকার চালাতে হয়েছে। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৮০টা দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আমরা জাতিসংঘের এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যও হতে যাচ্ছি। আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর বলতে কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে দেশরক্ষা দপ্তরও ছিল না। অর্থ দপ্তরটিও একটি নেজারাতের মতো ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। স্কুল-কলেজের অবস্থাও ছিল তথৈবচ।

মোট কথা, স্কুল-কলেজ ভাঙা ছিল। আমাদের সবকিছুই ছিল বিধ্বস্ত। এমন দেশ নেই যেখানে বিপ্লবের পরে দুই-চারবার দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত খাবার দিতে না পারলেও বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু খাবার পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমরা অনেকগুলো কমিশন গঠন করেছি এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোনো দেশ চলতে পারে না। আমরা যে সমস্ত কমিশন গঠন করেছি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা কমিশন, বেতন কমিশন। শীঘ্রই বেতন বোর্ড, চাকুরি পুনর্বিন্যাস কমিশনও গঠন করা হবে।

স্ক্রিনিং

সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং করার জন্য স্ক্রিনিং কমিটি করা হয়েছে। যারা দালালি করেছে, তাদের বিষয় স্ক্রিনিং কমিটিতে আসবে এবং কমিটির বিচার-বিবেচনার ফলাফল খবরের কাগজে দেওয়া হবে। যাদের ওপর আপনাদের আস্থা আছে, সে সমস্ত লোক নিয়েই কমিটি গঠিত হয়েছে। তাদের ভিতর হাইকোর্টের জজও রাখা হয়েছে। যাতে কেউ বলতে না পারেন, রাজনৈতিক কারণে আমি আওয়ামী লীগ ও তার বন্ধু দলগুলোকে বাদ দিয়ে কেবল অন্য দলের লোকদের স্ক্রিনিং করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়েও স্ক্রিনিং চলছে। তবে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। এজন্য স্ক্রিনিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তারাই নেবেন। আমাকে বলা হয়েছে, সিন্ডিকেট প্রস্তাব পাস করেছে, সরকার যে হাইকোর্ট জজ দিয়ে স্ক্রিনিং কমিটি করেছে তার কাছেই তারা রিপোর্ট পেশ করবেন। আপনারা সরকারি কর্মচারীদের স্ক্রিনিং চান, শিক্ষকদের স্ক্রিনিং চান, বেতারের স্ক্রিনিং চান। অনুগ্রহ করে একটু নিজেদেরও স্ক্রিনিং করুন। একটু বলুন এই লোকগুলো এই কাজ করেছে। আমরা তা মেনে নেব। আর যদি নিজেরা কিছু না করেন আমাকে বলবেন। আমি করব। আমাকে করতেই হবে। কারণ, পাকিস্তানের নামে পয়সা নিয়ে এসে যদি কেউ রাতারাতি খবরের কাগজ বের করে আর মানুষের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে আমাদের সব নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে, বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবার চেষ্টা করে এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াবার চেষ্টা করে, জাতির আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে সেটাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সে স্বাধীনতা কোনো সরকার, কোনো জনগণ, কোনো প্রগতিশীল দল কোনোদিন সমর্থন করতে পারে না।

ধর্মঘট

আপনারা যেসব দাবি করেছেন, সেগুলো ন্যায্য। সেগুলোর জন্য আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আমরা যতদূর সম্ভব দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করছি।

আপনারা বলেছেন, ধর্মঘট বন্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো ধর্মঘট বন্ধ করি নাই। তবে সমাজতন্ত্রের একটা নীতি আছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, শ্রমিকদের কর্তব্য কী সেটাও বুঝতে হবে। এবং শ্রমিকরাই সমাজতন্ত্র চায় বেশি। কিন্তু যখন সরকারের আয় নাই, তখন ২৫ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির পরও যদি এটা-ওটা নিয়ে ঘেরাও বা জোরজবরদস্তি চলে, তাহলে কী হয়? এটা কোন ধরনের সমাজতন্ত্র?

আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন যারা সত্যিকার শ্রমিক, তারা এসব করছে না। কিছু কিছু লোক করছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যই ধর্মঘট বন্ধ করা হয়েছে। তাও মাত্র ছ'মাসের জন্য। আপনারা বিশ্বাস করুন, কারও অধিকার কেউ নষ্ট করুক এ আমি কখনো চাই না। আমি জীবনভর আন্দোলন করেছি। এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমি এতদূরে এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমি কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। এ সরকারও কারও ব্যক্তি অধিকার নষ্ট করতে চায় না। যেখানে কাজ জানা লোক নাই, ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নাই, সমাজতন্ত্রের জ্ঞান নাই, সেখানে ব্যাংক এবং ইনস্যুরেন্স কোম্পানিসহ সমস্ত মূল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি কেউ পয়সার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেখানে আমি বাধা না দিয়ে কী করতে পারি? আমি কি বলতে পারি যে, সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করুক?

"স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবু বিপ্লবের পরে ছ'মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন, ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই। কিন্তু অনেকেই তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে"

শহিদের পরিবারের জন্য সাহায্য

যারা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারবর্গকে সাধ্যমতো সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া চাঁদা তুলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল গঠন করে শহিদদের প্রত্যেক পরিবারকে দুই হাজার থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। শহিদ সরকারি কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনকে পেনশন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং মালিকহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাঁরাও জীবনভর একটা কিছু করে খেতে পারেন। তাঁরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করে পঙ্গু হয়েছেন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও এসবের একটা অংশ দেওয়ার জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। কেউ বাদ পড়বেন না। সবাই সেখান থেকে কিছুটা সাহায্য-সহানুভূতি পাবেন।

সাংবাদিকদের কাছে দাবি

আপনাদের দাবি-দাওয়ার উত্তরে আমিও কিছু দাবি জানাচ্ছি। আমি চাই আপনারাও স্ক্রিনিং করুন। যারা ন'মাস এখানে ছিল, তাদের কারও কারও সম্পর্কে দলিলপত্র আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের গায়ে যদি আমি হাত দিই আশা করি, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি সরকারি কর্মচারীকে জেলে দিয়েছি, হাইকোর্টের জজকে জেলে দিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে জেলে দিয়েছি, এ দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগের এমসিএ-কেও জেলে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে যাদের অপরাধী পাব, তাদের নিশ্চয়ই ধরতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারী বাড়াবাড়ি করলেও আপনারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে দালাল আইনে হাকিম আছে, কোর্ট আছে, বিচার হচ্ছে। সরকার যদি আসামির বিরুদ্ধে দলিলপত্র দাখিল করতে না পারে, তাহলে সে খালাস হয়ে যাবে।

সরকারের সমালোচনা

স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, তা রক্ষা করা তার চেয়েও কষ্টকর। স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তবু বিপ্লবের পরে ছ'মাসের মধ্যে আপনারা যতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন, ততখানি স্বাধীনতা এদেশে এর পূর্বে কেউ পায় নাই। কিন্তু অনেকেই তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্মে মেতে উঠেছে। তার জন্যে আমাকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন, কারফিউ দিয়ে তল্লাশি চালানো। এতে কিছু সৎ লোকের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এই অসুবিধা এড়ানোর উপায় নাই। আর অসৎ লোকদের তো আমি আগেই সতর্ক হওয়ার সময় দিয়েছিলাম।

কোনো কোনো কাগজে সমালোচনা করে বলা হয়, এখনকার অবস্থা আইয়ুব-ইয়াহিয়া সরকারের আমলের চেয়েও খারাপ। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল ল জারি হয়েছিল এবং আমাকে বন্দি করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখেন নাই। আবার এরাই এখন লেখেন, 'চালের মণ একশো বিশ টাকা।' চাল থাকতেও আমি দিচ্ছি না। কিন্তু আমি তো তা বলি নাই। আমি শুধু চেষ্টা করছি। এবং কিছু কিছু দিচ্ছি। চালের দাম মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্কের সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে, তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকের স্বাধীনতা?

সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আপনারা লেখেন। আপনারা জানেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জবাব দেওয়ার অধিকার নাই। যদি কেউ কারও নাম করে কিছু লেখেন এবং সে যদি কোনো প্রতিবাদ করে তাহলে সেটা প্রকাশ করাও সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেক সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেই তো মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু কারও প্রতিবাদই খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। এটা সাংবাদিকতার কোন নীতিমালায় আছে।

ভীতিপ্রদর্শন (ব্ল্যাকমেলিং)

আমি আরও একটা প্রবণতা লক্ষ করছি। এটা বাংলাদেশে আগে ছিল না। আমি এটা দেখেছি করাচিতে আর দেখেছি পিন্ডিতে। এটা হলো

ভীতিপ্রদর্শন। কোনো সাপ্তাহিক বা সান্ধ্য দৈনিক কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখে তাকে বলা হতো, টাকা দাও, নইলে আবার তোমার বিরুদ্ধে লেখা হবে। তখন সত্যি সত্যিই টাকা দিয়ে সে কাগজের মুখ বন্ধ করা হতো। আমি লক্ষ করছি, এখানেও এই ধরনের একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আরও দেখা যাচ্ছে, যার আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই, সেও দৈনিক কাগজ বের করছে। রাতারাতি কাগজটা বের হয় কোথা থেকে? পয়সা দেয় কে? আমি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছি। এর জন্য তারা কেঁদে মরে। তাদের পয়সা আসে কোত্থেকে? আমি যদি খবর পাই যে, বিদেশিরা তাদের সাহায্য করছে এবং তখন যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলেও কি আপনারা বলবেন, সংবাদপত্রে ও সাংবাদিকদের ওপর অন্যায় হামলা করা হয়েছে?

আপনারা জানেন, আমি ঢাকা শহরে সাইকেল নিয়ে ঘুরে রাজনীতি করেছি। কিন্তু এখন কিছু কিছু লোক রাতে হাইজ্যাকের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দিনের বেলায় বিপ্লব করে। তারা দুষ্কৃতকারী। তাদের আয়ের কোনো প্রকাশ্য উৎস নাই। অথচ প্রচুর টাকা খরচ করে। এ টাকা আসে কোত্থেকে? কে দেয়? আমি যদি এসবের তদন্ত করি, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না। আশা করি, এটাও আইন।

আদর্শের রূপায়ণ

আমি জানি, আমার মতো আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা দেশকে বাঁচাতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে বাধা দূর করার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। এজন্য যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজাকার, আলবদররা এখন কিছু কিছু বড়ো বড়ো প্রগতিশীল নেতার আশ্রয় নিয়ে 'প্রগতিশীল' বনে গেছে। আসলে তারা খুনের মামলার আসামি। তাদের নামে হুলিয়া রয়েছে। এখন তাদের কেউ বলে, আমি ওমুক নেতার সেক্রেটারি, কেউ বলে আমি সম্পাদক। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী, আপনারাই বলুন।

সাংবাদিকদের স্বার্থ

আপনারা সাংবাদিক। আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে হলে আপনারা নিজেরাও আত্মসমালোচনা করুন। আপনারা শিক্ষিত, আপনারা লেখক, আপনারা ভালো মানুষ। আপনারাই বলুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব।

আপনাদের দাবি-দাওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি বড়ো খুশি হয়েছি। আমি সারাজীবন আপনাদের সঙ্গে সংগ্রামে ছিলাম। এখনো আমি সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের ন্যায্য পাওনা যা আছে, তা নিশ্চয়ই আপনারা পাবেন। কিন্তু তার বেশি চাইলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পারব না। বাংলাদেশের মানুষকে আমি বলেছি, তিন বছর কিছুই দিতে পারব না, তারা তা মেনে নিয়েছে। আশা করি, আমার সাংবাদিক ভাইয়েরাও বলবেন, তিন বছর কিছুই চাই না। কারণ, আপনারা কোনো পৃথক জাত নন। আপনারা সাত কোটি লোকের একটা অংশ। তাছাড়া গণতন্ত্রেও একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও একটা নীতিমালা আছে। এ দুটো মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারব।

জয় বাংলা।

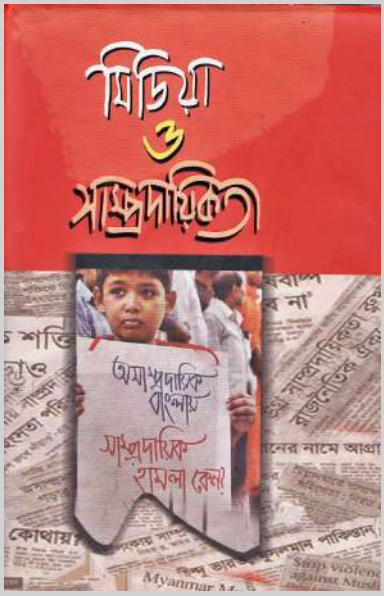

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

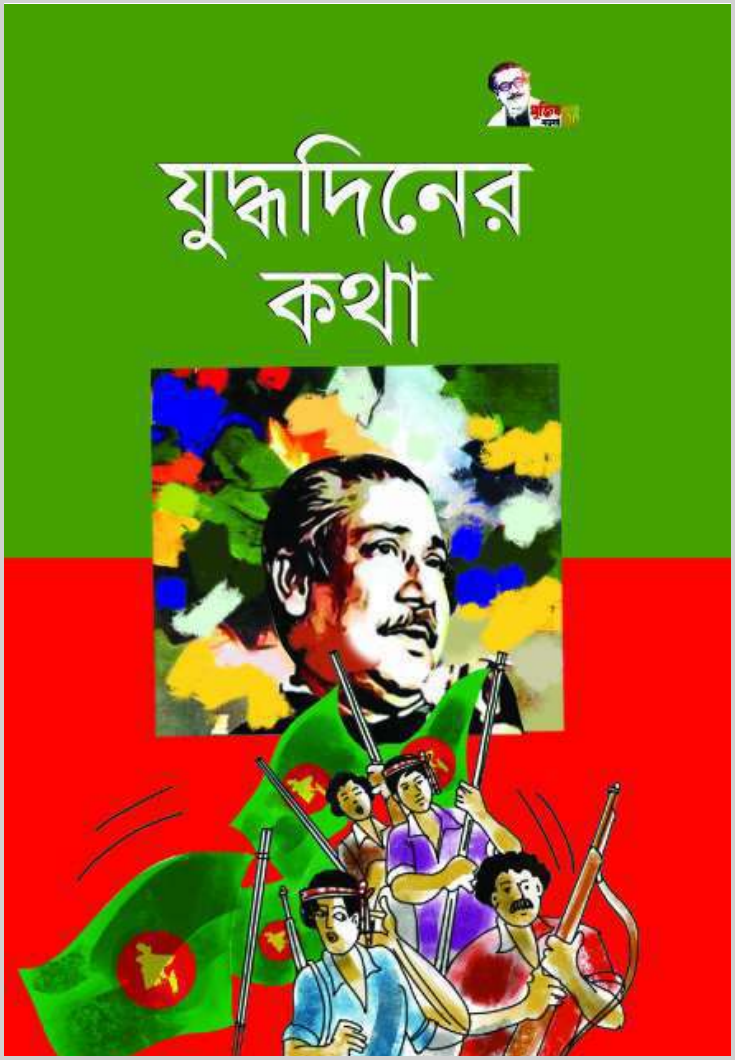

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা